সাহিত্য সঞ্চয়

[প্রথম ভাগ]

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VII. Vide Notification No. 76/7/TB/38 Dated 24. 12. 76.

সাহিত্য সঞ্চয়

(সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য)

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. বি. টি.
প্রধান শিক্ষক কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় (সর্বার্থ সাধক)

ও

শ্রীবিমলকান্তি চট্টোপাধ্যায়, এম. এ বি. টি.
ইতিহাস ভারতী, সাহিত্য ভারতী (বিশ্বভারতী)
প্রধান শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাপিঠ উচ্চ বিদ্যালয়
নৈমিষারণ্য, বোরহাট, বর্ধমান।

S.C.E.R.T., West Bengal Library Calcutta 25/3, B. T. Road

কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

সূচীপত্র

(গদ্যাংশ)

(পদ্যাংশ)

যখন তিনটার সময় শিয়ালদহে দার্জিলিঙের গাড়িতে উঠিলাম তখন আমার মনে বড়ো আনন্দের উদয় হইল। উঁচু জায়গার মধ্যে—মাণিকতলার খাল কাটার সময়ে মাটি জমা হইয়াছিল, তাহাই দেখিয়াছি। আর অত্যন্ত মোটা রামশঙ্কর কামারকে পাড়ার লোকেরা পর্বত বলিয়া থাকে, তাহাকেও দেখিয়াছি—ইহা হইতে হিমালয়ের ভাব যতটা পাওয়া যায় তাহা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এবার স্বয়ং হিমালয়ে সশরীরে যাইতেছি, হিমালয় পর্বত সশরীরে স্বচক্ষে দেখিব, একথা যতই মনে হইতে লাগিল আনন্দে আমার বক্ষঃস্থল হিমালয় অপেক্ষা ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

সন্ধ্যা সাতটার সময় দামুকদিয়া স্টেশনে পৌঁছিলাম। দার্জিলিং-যাত্রীদের এই স্টেশনে নামিতে হয় এবং পদ্মানদী পার হইয়া অন্য এক

ট্রেনে চড়িতে হয়। আমরা যখন এখানে আসিয়া পৌঁছিলাম তখন মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। জাহাজে উঠিলাম। নদী পার হইতে পনেরো মিনিটের কিছু বেশি লাগে। পার হইয়া দেখি যে, সারাঘাট স্টেশনে অন্য এক ট্রেন প্রস্তুত আছে। তাহাতে উঠিয়া পড়িলাম। এখানকার গাড়িগুলি ছোটো ছোটো। ট্রেনের ঝাঁকানিতে আমার বেশ নিদ্রা হয়, সুতরাং রাত্রিটি বেশ কাটিয়া গেল। ভোর ছয়টার কিছু পূর্বে স্টেশনে গাড়ি থামিল। আমরা চা পান করিয়া লইলাম। একঘন্টা পরে শিলিগুড়ি স্টেশনে গাড়ি থামিল। এইস্থানে কলের ট্রামগাড়ীতে চড়িয়া পাহাড়ে উঠিতে হয়। এখানে দিব্য আহারের স্থান আছে। ট্রামগাড়ি প্রস্তুত আছে তাহাতে চড়িলাম। এ স্থানের ট্রামগাড়িগুলি নূতন ধরণের, খান আঠারো গাড়ির মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িগুলি চতুর্দিকে শার্সি দ্বারা ঢাকা, বাকি কতকটা চিৎপুর রোডের ট্রামগাড়ির মতো ফাঁকা। এই ফাঁকা গাড়িতে চড়িলে চারিদিকের দৃশ্য বেশ ভালো দেখা যায়, সুতরাং আমরা তাহাতেই বসিলাম। শিলিগুড়িতে পৌছিয়া যাত্রীদের গরম কাপড় পরিতে হয়। আমি কাপড় ছাড়িলাম। ট্রামগাড়ি ছাড়িল। চারিদিকে ধানের ক্ষেত্র, মধ্যে মধ্যে চা-ক্ষেত্রের সুন্দর শোভা দেখিতে দেখিতে গাড়ি পাহাড়ের নীচে আসিল। এইবার পাহাড়ের উপরে উঠিতে আরম্ভ করা গেল। ঘন এক শালবনের মধ্য দিয়া গাড়ি চলিয়াছে, চারিদিকে বড়ো বড়ো শালগাছ ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। কতক্ষণ পরে গাড়ি ঘুরিয়া এক ফাঁকা জায়গায় আসিল ; তখন নীচের দিকে চাহিয়া দেখি, আমরা পাহাড়ের উপরে। কখনো দক্ষিণে প্রকাণ্ড পাহাড়, বামে খদ, কখনো বা দক্ষিণে খদ ও বামে পাহাড়। ট্রামের রাস্তা মস্ত সাপের মতো পাহাড় ঘিরিয়া অল্প উচ্চ হইয়া উপরে উঠিয়াছে। এরূপ

ঘুরিতে ঘুরিতে চলিলাম। মাঝেমাঝে স্টেশন আছে। প্রথম স্টেশন তিনদরিয়া শিলিগুড়ি হইতে নয় ক্রোশ, এখানে ট্রেন পনেরো মিনিট থাকে। তিনদরিয়া হইতে যখন গাড়ি ছাড়িল তখন চতুর্দিকে মেঘ ঘন কুয়াশার মতো সাদা হইয়া চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। মেঘের ভিতর দিয়া গাড়ি চলিতে লাগিল। আশেপাশের ঘরবাড়ি ছাড়া দূরের কিছু দেখা যায় না, সমস্ত মেঘে ঢাকা। এক ক্রোশ উপরে যখন গাড়ি উঠিল, তখন ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বৃষ্টি হইতেছে, মেঘ ঈষৎ কাটিয়া আসিতেছে; নীচের পাহাড়ে চাহিয়া দেখি, সেখানে দিব্য রৌদ্র ফুটফুট করিতেছে। এইরূপ আশ্চর্য দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনে হইল, পৃথিবী ছাড়িয়া উপরে স্বর্গের পথে যাইতেছি। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে গয়াবাড়ি স্টেশনে পৌঁছিলাম। এখান হইতে গাড়ি ছাড়িলে নীচের পাহাড়ে কতগুলি চা-ক্ষেত্র দেখা যায়। দূর হইতে চা-ক্ষেত্রগুলি অতি সুন্দর দেখায়; মনে হয়, কে যেন পাহাড়ের গায়ে ছোটো ছোটো সবুজ ফোঁটা পরাইয়া দিয়াছে। আমরা কার্সিয়ং স্টেশনে পৌঁছিলাম। পূর্বে এ একটি ক্ষুদ্র পাহাড়-পল্লী ছিল মাত্র, কিন্তু ক্রমে পাহাড়ের সমস্ত স্টেশনের মধ্যে একটি প্রধান শহর হইয়া দাঁড়াইতেছে। কার্সিয়ং ৪৫০০ ফিট উচ্চ। যখন এখানে পৌঁছিলাম তখন আমি শীতে কাঁপিতেছি।

এর পর সোনাদহ স্টেশন একটি ক্ষুদ্র পল্লী; কতকগুলি অপরিষ্কার বাজার দেখা যায় মাত্র। এখান হইতে ছাড়িয়া ঘুম স্টেশনে পৌঁছানো গেল! অনেকে বলেন যে, পৃথিবীর কোন পাহাড়ের উপর এত উচ্চে রেলগাড়ি যায় নাই। ইহা ৭৪০০ ফিট উচ্চ। দার্জিলিং এই স্থান হইতে দুই ক্রোশ নীচে, সুতরাং গাড়ি নীচে নামিতে আরম্ভ করিল। নামিবার সময় দক্ষিণদিকে 'জলা' পাহাড়ের উপরে সৈন্যদের বারিক

অল্প অল্প দেখিতে পাওয়া যায় এবং বামে অনেক দূরে 'টণ্ডলু' পর্বত ও হিমালয়ের শৃঙ্গ 'সিঙ্গলীলা' এবং নিকটে সারি সারি অনেক চা-ক্ষেত্র দেখা যায়। এক ক্রোশ নীচে যখন গাড়ি থামিল তখন দূর হইতে দাজিলিংয়ের ছোটো ছোটো সাদা সাদা বাড়িগুলি পাহাড়ের গায়ে ছবির মতো বোধ হইতে লাগিল। এইরূপ মেঘ, বৃষ্টি, রৌদ্রের মধ্য দিয়া পাহাড়, নদী নির্ঝর ও নানাপ্রকার মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে দার্জিলিং পৌঁছিতে ছয় ঘন্টা লাগে। এই ছয় ঘন্টা যে কী সুন্দররূপে অতিবাহিত হয় তাহা লিখিয়া বর্ণনা করিতে আমি একেবারে অক্ষম। বেলা দশটার সময় শিলিগুড়ি ছাড়িয়া বৈকালে চারিটার সময় দার্জিলিং পৌঁছিলাম।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুশীলনী

১। দার্জিলিং যাইবার আগে লেখকের মনের অবস্থা কিরূপ ছিল ?

২। তিনি কিরূপে শিলিগুড়ি পৌছাইলেন ? সেখানে কি দেখিতে পাইলেন ?

৩। 'যখন এখানে পৌছিলাম তখন আমি শীতে কাঁপিতেছি'। কোন্ স্থান সম্পর্কে এই কথা বলা হইয়াছে ? লেখক কিরূপে সেখানে পৌছিলেন তাহা বর্ণনা কর।

৪। সোনাদহ হইতে দার্জিলিং পর্যন্ত লেখকের বর্ণনানুযায়ী অভিজ্ঞতা নিজের ভাষায় লিখ।

৫। রবীন্দ্রনাথের দার্জিলিং যাত্রা'র একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

৬। বিপরীত পদ লিখ :—উচুঁ, উদয়, ফাঁকা, ঘন, মোটা, প্রস্তুত।

৭। শব্দার্থ লিখ :—সশরীরে, খদ, দিব্য, পল্লী, মনোহর, অক্ষম, মুষলধারে, বারিক।

৮। বাক্য রচনা কর :—বড়োবড়ো, অল্পঅল্প, ঝম্‌ঝম্‌, ফুটফুট, ছোটোছোটো, সারি সারি।

৯। কারক ও বিভক্তি লিখ।

(ক) ট্রেনের **ঝাঁকানিতে** আমার বেশ নিদ্রা হয়।

(খ) চতুর্দিকে **শার্সি দ্বারা** ঢাকা।

(গ) পরে গাড়ি ঘুরিয়া একটা ফাঁকা **জায়গায়** আসিল।

(ঘ) কতকগুলি অপরিষ্কার **বাজার** দেখা যায় মাত্র।

(ঙ) **দূর হইতে** চা-ক্ষেত্রগুলি অতি সুন্দর দেখায়।

গ্রামে মহামারী আরম্ভ হইয়া গেল।

যাহার পালাইবার স্থান ছিল সে পলাইল। অধিকাংশেরই ছিল না, তাহারা ভীত শুষ্ক মুখে সাহস টানিয়া আনিয়া কহিল—অন্নজল ফুরাইলে যাইতে হইবে। পলাইয়া কি করিব?

বৃন্দাবনের বাড়ীর সম্মুখ দিয়াই গ্রামের পথ। তথায় যখন-তখন ভয়ঙ্কর হরিধ্বনিতে ক্রমাগতই জানা যাইতে লাগিল, ইহাদের অনেকেরই অন্নজল প্রতিনিয়তই নিঃশেষ হইতেছে। আশেপাশের গ্রামেও দু,একটা মৃত্যুর কথা শোনা যাইতে লাগিল বটে, কন্ত 'বাড়লের' অবস্থা প্রতিমুহূর্তেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

ইহার প্রধান কারণ, গ্রামের অবস্থা অন্যান্য বিষয়ে ভাল হইলেও পানীয় জলের বন্দোবস্ত ছিল না। নদী নাই, যে দুই চারিটি পুষ্করিণী

পূর্বে উত্তম ছিল, তাহা সংস্কারের অভাবে মজিয়া উঠিয়া প্রায় অব্যবহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অথচ কাহারও তাহাতে ভ্রুক্ষেপ মাত্র ছিল না। গ্রামবাসীদের অনেকেরই বিশ্বাস,—জলে তৃষ্ণা নিবারণ ও আহার্য পাক করিবার ক্ষমতা থাকা পর্যন্ত তাহার ভালোমন্দের দিকে চাহিবার আবশ্যকতা নাই।

এদিকে গোপাল ডাক্তার ছাড়া আর চিকিৎসক নাই। তিনি কাঙালের ঘরে যাইবার সময় পান না। অথচ মড়ক প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। ক্রমশঃ এমন হইয়া উঠিল যে ঔষধ-পত্র ত দূরের কথা, মৃতদেহ সৎকার করাও দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। শুধু বৃন্দাবনের পাড়াটাই তখনও নিরাপদ ছিল। বৃন্দাবনের পিতা নিজেদের ব্যবহারের নিমিত্ত যে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন তাহার জল তখনও দূষিত হয় নাই। প্রতিবেশি গৃহস্থেরা এই পানীয় ব্যবহার করিয়াই সম্ভবতঃ এখনও মৃত্যু এড়াইয়া ছিল।

তারিণী মুখুজ্যের ছোট ছেলে মরিয়াছে। পরদিন সন্ধ্যেবেলা বৃন্দাবন কি কাজে ঐদিক দিয়ে আসিতেছিল,—দেখিতে পাইল তাহাদেরই পুকুরের ঘাটের উপরেই একটি স্ত্রীলোক কতকগুলি কাপড়-চোপড় কাচিতেছে। কতক কাচা হইয়াছে; কতক এখনও বাকী আছে। বস্ত্রগুলির চেহারা দেখিয়াই বৃন্দাবন শিহরিয়া উঠিল। নিকটে আসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "মড়ার কাপড়-চোপড় কি বলে আপনি পুকুরে পরিষ্কার করছেন"?

স্ত্রীলোকটি ঘোমটার ভিতর হইতে কি বলিল বোঝা গেল না। বৃন্দাবন বলিল—"অন্যায় যা করেছেন, আর ত উপায় নাই। কিন্তু আর ধোবেন না, উঠে যান।"

সে পরিষ্কৃত অপরিষ্কৃত বস্ত্রগুলি তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন জলের দিকে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উঠিয়া আসিতেছিল, দেখিল তারিণী দ্রুতপদে এইদিকে আসিতেছে। একে পুত্রশোকে কাতর, তাহাতে এই অপমান। আসিয়াই ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "তুমি নাকি আমার বাড়ির লোককে পুকুরে আসতে দাও নি।"

বৃন্দাবন কহিল, "তা নয়, ময়লা কাপড় ধুতে মানা করেছি।"

তারিণী চেঁচাইয়া উঠিয়া কহিল, "কোথায় ধোবো? থাকবো 'বাড়লে', কাপড় ধুতে যাব 'বন্দিবাটিতে'? উচ্ছন্নে যাবি বৃন্দাবন, ছোট লোক হ'য়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিলে নির্বংশ হবি।"

বৃন্দাবনের বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল। কিন্তু চেঁচামেচি করা, কলহ করা তাহার স্বভাব নয়, তাই আত্মসংবরণ করিয়া শান্তভাবে কহিল,—"আমি একা উচ্ছনে যাই, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু আপনি সমস্ত পাড়াটা যে উচ্ছন্নে দেবার আয়োজন করেছেন!"

"ব্রাহ্মণ উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করিল—"চিরকাল মানুষ পুকুরে কাপড়-চোপড় কাচে না ত কি তোমার মাথার উপর কাচে?"

বৃন্দাবন দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, "এ পুকুর আমার। নিষেধ না শুনলে আপনার বাড়ীর কোন লোককে পুকুরে নামতে দেব না।"

"নামতে দিবি নে ত আমরা যাব কোথায় বলে দে?"

বৃন্দাবন কহিল, "এখানে শুধু ব্যবহারের জল নিতে পারেন। কাপড়-চোপড় ধুতে হলে মাঠের ধারে ডোবাতে নিয়ে গিয়ে ধুতে হবে।"

তারিণী মুখ বিকৃতি করিয়া বলিল, "ছোট লোক হয়ে তোর এতবড় মুখ! তুই বলিস, মেয়েরা যাবে মাঠে কাপড় ধুতে? একলা আমার বাড়িতেই বিপদ ঢোকে নি রে, তোর বাড়িতেও ঢুকবে।"

বৃন্দাবন তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল—"আমি মেয়েদের যেতে বলিনি। আপনার ঘরে যখন দাসী-চাকর নেই তখন মানুষ হ'ন

ত নিজে গিয়ে ধুয়ে আনুন। আপনি এখন শোকে কাতর, আপনাকে শক্ত কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়, কিন্তু হাজার অভিসম্পাত দিলেও আমি পুকুরের জল নষ্ট করতে দেব না।" বলিয়া আর তর্কাতর্কির অপেক্ষা না করিয়া বৃন্দাবন বাড়ি চলিয়া গেল।

মিনিট দশেক পরে ঘোষাল মহাশয় আসিয়া সদরে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। তিনি তারিণীর আত্মীয়, বৃন্দাবন বাহিরে আসিতেই বলিলেন, "হাঁ বাপু বৃন্দাবন, তোমাকে সৎ ছেলে বলে জানে। একি ব্যবহার তোমার! ব্রাহ্মণ পুত্রশোকে মারা যাচ্ছে, তুমি তাদের পুকুর বন্ধ করে দিয়েছ নাকি?"

বৃন্দাবন কহিল—ময়লা কাপড়-চোপড় ধোওয়া বন্ধ করেছি, জল তোলা বন্ধ করি নি।

—"ভালো করনি বাপু, আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি। তোমার মান্য রেখে ঘাটের উপর না ধুয়ে একটু তফাতে ধোবে।"

বৃন্দাবন জবাব দিল, না। এই পুকুরটি মাত্র গ্রামের সম্বল। কিছুতেই আমি এমন দুঃসময়ে এর জল নষ্ট হতে দেব না।"

বিজ্ঞ ঘোষাল রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এ তোমার অন্যায় জিদ্। শাস্ত্রমতে প্রতিষ্ঠা করা পুষ্করিণীর জল কিছুতেই অপবিত্র বা কলুষিত হয় না। দু'পাতা ইংরেজি পড়ে শাস্ত্র বিশ্বাস না করলে চলবে কেন বাপু।"

বৃন্দাবন এ-কথা একশতবার শুনিতে শুনিতে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, বিরক্ত হইয়া বলিল—"শাস্ত্র আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু মন-গড়া শাস্ত্র মানিনে, যা' বলেছি তাই হবে, ওর জলে ময়লা ধুতে দেব না। আর কেউ হলে এসব কাপড় পুড়িয়ে ফেলত, কিন্তু আপনারা যখন মায়া ত্যাগ করতে পারবেন না, তখন মাঠের ডোবা থেকে পরিষ্কার

করে আনুন, আমার পুকুরে ওসব চলবে না।" এই বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

এদিকে ঘোষাল মহাশয় বৃন্দাবনের সর্বনাশ কামনা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অনুশীলনী

১। 'কুসংস্কার' গল্পাংশটিতে পল্লী সমাজের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

২। বৃন্দাবনের চরিত্র বর্ণনা কর!

৩। বৃন্দাবন, তারিণী ও ঘোষাল মহাশয়ের কথাবার্তার মধ্য দিয়া বুঝাইয়া দাও কে কি রকমের লোক?

৪। সন্ধি বিচ্ছেদ কর—অধিকাংশ, অন্যান্য, সংস্কার, নিরাপদ পরিষ্কার, ক্রমাগত, তর্কাতর্কি।

৫। পদ-পরিবর্তন কর—গ্রাম, পানীয় ব্যবহার, প্রতিষ্ঠা, রুষ্ট, নষ্ট, পরিশ্রান্ত বিরক্ত, উদ্ধত।

৬। বিপরীত শব্দ লিখ—বিজ্ঞ, স্ত্রীলোক, বিশ্বাস, পরিষ্কার, আরম্ভ।

৭। শব্দার্থ লিখ—মহামারী, প্রতিনিয়ত, আহার্য, আত্মসংবরণ, মুখবিকৃতি, মান্য, মনগড়া, অভিপ্রায়, অভিসম্পাত, নির্বংশ।

৮। বাক্য রচনা কর:—

ডাকাডাকি, অন্নজল, ভালোমন্দ, সম্ভবতঃ, কাপড়-চোপড়, দাসী-চাকর, তর্কাতর্কি।

৯। কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর:—

(ক) স্ত্রীলোকটি ঘোমটার **ভিতর হইতে** কি বলিল, বোঝা গেল না।

(খ) স্ত্রীলোকটি কতকগুলি **কাপড়-চোপড়** কাচিতেছে।

(গ) বৃন্দাবন শান্ত অথচ **দৃঢ়কণ্ঠে** জবাব দিল।

(ঘ) আপনি এখন **শোকে** কাতর।

(ঙ) **তোমাকে** সবাই সৎ ছেলে বলে জানে।
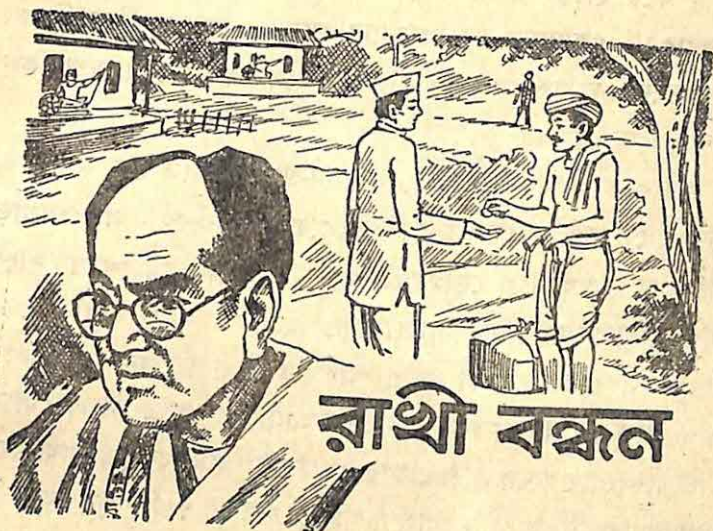
রাখী বন্ধন

তখনকার সেই স্বদেশী যুগে ঘরে ঘরে চরকা কাটা, তাঁত বোনা বাড়ির গিন্নি থেকে চাকরবাকর দাসদাসী কেউ বাদ ছিল্ না। মা দেখি একদিন ঘড়ঘড় করে চরকা কাটতে বসে গেছেন। মার চরকা কাটা দেখে হ্যাভেল সাহেব তার দেশ থেকে মাকে একটা চরকা আনিয়ে দিলেন। বাড়িতে তাঁত বসে গেল, খটাখট শব্দে তাঁত চলতে লাগল। মনে পড়ে এই বাগানেই সূতো রোদে দেওয়া হত। ছোটো ছোটো গামছা, ধুতি তৈরি করে মা আমাদের দিলেন—সেই ছোটো ধুতি, হাঁটুর ওপর উঠে যাচ্ছে, তাই প'রে আমাদের উৎসাহ কত।

একদিন রাজেন মল্লিকের বাড়ি থেকে ফিরছি পল্লীসমিতির মিটিংয়ের পর, রাস্তার মোড়ে একটা মুটে মাথা থেকে মোট নামিয়ে

সেলাম করে হাতে পয়সা কিছু গুঁজে দিলে, বললে, আজকের রোজগার। একদিনের সব রোজগার স্বদেশের কাজে দিয়ে দিলে। মুটেমজুরদের মধ্যেও কেমন একটা ভাব এসেছিল স্বদেশের জন্যে কিছু করবার, কিছু দেবার।

রবি কাকা একদিন বললেন, রাখীবন্ধন-উৎসব করতে হবে আমাদের, সবার হাতে রাখী পরাতে হবে। উৎসবের মন্ত্র অনুষ্ঠান সব জোগাড় করতে হবে, তখন তো তোমাদের মতো আমাদের বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন না, ক্ষিতিমোহন বাবুও ছিলেন না কিছু একটা হলেই মন্ত্র বাৎলে দেবার। কী করি, থাকবার মধ্যে ছিলেন ক্ষেত্রমোহন কথক ঠাকুর, রোজ কথকতা করতেন আমাদের বাড়ি, কালো মোটা-সোটা তিলভাণ্ডেশ্বরের মতো চেহার। তাঁকে গিয়ে ধরলুম, রাখী-বন্ধন উৎসবের একটা অনুষ্ঠান বাৎলে দিতে হবে। তিনি খুব খুশী ও উৎসাহী হয়ে উঠলেন, বললেন, এ আমি পাঁজিতে তুলে দেব, পাঁজির লোকদের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে, এই রাখীবন্ধন উৎসব পাঁজিতে থেকে যাবে। ঠিক হল, সকালবেলা সবাই গঙ্গাস্নান করে সবার হাতে রাখী পরাব। এই সামনেই জগন্নাথ ঘাট, সেখানে যাব— রবিকাকা বললেন, সবাই হেঁটে যাব, গাড়ি-ঘোড়া নয়। কী বিপদ, আমার আবার হাঁটাহাঁটি ভালো লাগে না। কিন্তু রবিকাকার পাল্লায় পড়েছি, তিনি তো কিছু শুনবেন না। কী আর করি—হেঁটে যেতেই যখন হবে, চাকরকে বললুম, যে সব কাপড়জামা, নিয়ে চল্ সঙ্গে। তারাও নিজের নিজের গামছা নিয়ে চলল স্নানে, মনিব-চাকর একসঙ্গে সব স্নান হবে। রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দুধারে বাড়ীর ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাথ অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে—মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁক বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম—যেন একটা

শোভাযাত্রা। দিনু ছিল সঙ্গে, গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পূণ্য হউক, পূণ্য হউক, পূণ্য হউক হে ভগবান।

এই গানটি সেই সময়েই তৈরী হয়েছিল। ঘাটে সকাল থেকে লোকে লোকারণ্য, রবিকাকাকে দেখবার জন্য আমাদের চারিদিকে ভিড় জমে গেল। স্নান সারা হল—সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল এক গাদা রাখী, সবাই এ ওর হাতে রাখী পরালুম। অন্যরা যারা কাছাকাছি ছিল তাদেরও রাখী পরানো হল। হাতের কাছে ছেলেমেয়ে যাকে পাওয়া যাচ্ছে, কেউ বাদ পড়েছে না, সবাইকে রাখী পরানো হচ্ছে। গঙ্গার ঘাটে সে এক ব্যাপার। পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতকগুলো সহিস ঘোড়া মলছে, হঠাৎ রবিকাকারা ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখী পরিয়ে দিলেন।

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুশীলনী

১। স্বদেশী যুগে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লেখক দেখিয়াছেন তাহা বর্ণনা কর।

২। রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিতে যাওয়ার একটি বিবরণ দাও।

৩। রাখীবন্ধন উৎসব কি ভাবে পালন করা হইয়াছিল ?

৪। রাখীবন্ধন উৎসব কবে ও কি উপলক্ষে পালিত হয় শিক্ষকমহাশয়ের সাহায্যে বর্ণনা কর।

৫। "বাংলার মাটি বাংলার জল" গানটি কে গেয়েছিলেন। সম্পূর্ণ গানটি শিক্ষকমহাশয়ের কাছ থেকে জেনে নাও ও মনে রাখ।

৬। শব্দার্থ লিখ :—

মাত্র, অনুষ্ঠান, রওনা, ধূমধাম, শোভাযাত্রা, লোকারণ্য, কথকতা, সহিস, মিছিল।

৭। বাক্য রচনা কর :—

ঘড়ঘড়, খটাখট, হাঁটাহাঁটি, মনিবচাকর, কাছাকাছি, ধাঁ করে।

৮। পদ-পরিবর্তন কর :—

উৎসাহ, বন্ধন, পুণ্য, খুশি, আরম্ভ, বিপদ।

৯। কারক ও বিভক্তি লিখ :—

(ক) একদিন রাজেন মল্লিকের **বাড়ী** থেকে ফিরছি।

(খ) সবার **হাতে** রাখী পরাতে হবে।

(গ) আমার আবার **হাঁটাহাঁটি** ভাললাগে না।

(ঘ) **চরকা** কাটতে বসে গেছেন।

(ঙ) সহিস **ঘোড়া** মলছে।

সেদিন তাহার দিদি চুপি চুপি বলে—চড়ুইভাতি করবি অপু?

নীলমণি রায়ের জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার ওধারের খানিকটা বন দুর্গা নিজের হাতে দা দিয়া পরিষ্কার করিয়া ভাইকে বলিল—দাঁড়িয়ে দেখ তেঁতুলতলায় মা আসছে কিনা—আমি চাল বের করে নিয়ে আসি শীগগির করে।

একটা ভালো নারিকেলের মালায় দুইপলা তেল সে চুপি চুপি তেলের ভাঁড়টা হইতে বাহির করিয়া আনিল। অপহৃত মাল বাহিরে আনিয়া ভাইয়ের জিম্মা করিয়া বলিল—শীগগির নিয়ে যা, দৌড়ে অপু—সেখানেই রেখে আয়। দেখিস যেন গোরুটোরুতে খেয়ে ফেলে না—দু'জনে জিনিসপত্র লইয়া চলিল।

চারিদিকে বনে ঘেরা। বাহির হইতে দেখা যায় না। খেলাঘরের

মাটির ছোবার মত ছোট একটা হাঁড়িতে ভাত চড়াইয়া দিয়া বলিল—এই দ্যাখ অপু কত বড় বড় মেটে আলুর ফল নিয়ে এসেছি এক জায়গা থেকে। পুঁটিদের তালতলায় একটা ঝোপের মধ্যে অনেক ধরে আছে। ভাতে দেবো···

অপু মহা উৎসাহে শুকনা লতা-কাঠি কুড়াইয়া আনে। এই তাহাদের প্রথম বনভোজন। অপুর এমন বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এখানে সত্যিকারের ভাত-তরকারী রান্না হইবে। খেলাঘরের বনভোজন, যাহা কতবার হইয়াছে, বুঝি সেইরকম হইবে,—ধূলার ভাত, খাপরার আলু ভাজা, কাটাল পাতার লুচি।

কিন্তু বড় সুন্দর বেলাটি। —বড় সুন্দর স্থান বনভোজনের। চারিধারে বনঝোপ, ওদিকে তেলাকুচা পাতার ঝুলুনি, বেলগাছের তলে জঙ্গলে ফুলের ঝাড়, ঘাসের উপরে খঞ্জর পাখীরা নাচিয়া নাচিয়া ছুঠিয়া বেড়াইতেছে, নির্জন ঝোপে নূতন কচি পাতা ঘেঁটফুলের ঝাড় পোড়ো ভিটাটা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে, বাতাবিলেবুর গাছটায় ক'দিনের কুয়াশায় ফুল অনেক ঝরিয়া গেলেও থোবা থোবা শাদা শাদা ফুল ওপরের ডালে চোখে পড়ে।

চড়ুইভাতির মাঝামাঝি অপুদের বাড়ীর উঠানে কাহার ডাক শোনা গেল। দূর্গা বলিল—বিনির গলা যেন—নিয়ে আয় তো ডেকে অপু। একটু পরে অপুর পিছনে পিছনে দূর্গার সমবয়সী একটি কালো মেয়ে আসিল। একটু হাসিয়া যেন কতকটা সম্ভ্রমের সুরে বলিল—কি হচ্ছে দুগ্ গা দি দি ?

দূর্গা বলিল—আয় না বিনি, চড়ুইভাতি কচ্চি বোস।

মেয়েটি ও পাঁড়ার ভোলানাথ চক্কত্তির মেয়ে—পরনে আধ-ময়লা শাড়ী, হাতে সরু সরু কাঁচের চুড়ি লম্বা গড়ন, নিতান্ত সাদাসিধা। বিনি

দুর্গার ফরমাইজ খাটিতে লাগিল খুব। বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ সে যেন একটা লাভজনক ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এখন ইহারা তাহাকে সে উৎসবের অংশীদার স্বীকার করিবে কি না করিবে—এরূপ একটা দ্বিধামিশ্রিত উল্লাসের ভাব তাহার কথাবার্ত্তায় ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাইতেছিল। দুর্গা বলিল—বিনি, আর দুটো শুক্‌নো কাঠ দ্যাখ্‌তো—আগুনটা জ্বলছে না ভাল

বিনি তখনি কাঠ আনিতে ছুটিল এবং একটু পরে একবোঝা শুকনা বেলের ডাল আনিয়া হাজির করিয়া বলিল—এতে হবে দুগ্‌গা দিদি—না আর আন্‌বো? দুর্গা যখন বলিল—বিনি এসেচে—ও-ওতো এখানে খাবে—আর দুটো চাল নিয়ে আয় অপু—বিনির মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খানিকটা পরে বিনি জল আনিয়া দিল। আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—কি কি তরকারী দুগ্‌গা দিদি? ভাত নামাইয়া দুর্গা তেলটুকু দিয়া বেগুন ভাজে। খানিকটা পরে সে অবাক হইয়া ছোবার দিকে চাহিয়া থাকে। অপু ডাকিয়া বলে—ঠিক একেবারে সত্যিকারের বেগুন-ভাজার মত রঙ হচ্চে দেখছিস্ অপু! ঠিক যেন মার রান্না বেগুন-ভাজা, না?

অপুর ব্যাপারটা আশ্চর্য্য বোধ হয়। তাহারও এতক্ষণ যেন বিশ্বাস হইতে ছিল না যে তাহাদের বন-ভোজনে সত্যিকার ভাত, সত্যিকার বেগুন-ভাজা সম্ভবপর হইবে! তাহার পর দু'জনে মহা আনন্দে কলার পাতে খাইতে বসে, শুধু ভাত আর বেগুন-ভাজা। অপু গ্রাস মুখে তুলিবার সময় দুর্গা সেদিকে চাহিয়া ছিল। আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে,—কেমন হয়েছে রে বেগুন-ভাজা?

অপু বলে,—বেশ হয়েছে দিদি, কিন্তু নুন হয়নি যেন—

লবণকে রন্ধনের উপকরণের তালিকা হইতে ইহারা একেবারে

বাদ দিয়েছে, লবণের বালাই রাখে নাই। কিন্তু মহা খুশিতে তিনজনে কোযো আলুর ফল ভাতে ও পান্‌সে আধ-পোড়া বেগুন-ভাজা দিয়া চড়ুই-ভাতির ভাত খাইতে বসিল। দুর্গার এই প্রথম রান্না সে বিস্ময়মিশানো আনন্দের সঙ্গে নিজের হাতের শিল্প সৃষ্টি উপভোগ করিতেছিল। এই বন-ঝোপের মধ্যে এই শুক্‌না আতা-পাতার রাশের মধ্যে, খেজুরতলায় ঝরিয়া-পড়া খেজুর পাতার পাশে বসিয়া বসিয়া সত্যিকারের ভাত-তরকারী খাওয়া!

খাইতে খাইতে দুর্গা অপুর দিকে চাহিয়া হিহি করিয়া খুশির হাসি হাসিল। খুশিতে ভাতের দলা তাহার গলায় আটকাইয়া যাইতেছিল যেন! বিনি খাইতে খাইতে ভয়ে ভয়ে বলিল—একটু তেল আছে দুগ্‌গাদি? মেটে আলুর ফল ভাতে মেখে নিতাম! দুর্গা বলিল—অপু, ছুটে নিয়ে আয় একটু তেল—

অপু বলিল—মাকে কি বলবি দিদি?—দূর, মাকে কখনো বলি! সন্দের পর দেখিস্ খিদে পাবে এখন—

আবার ওবেলা ভাত খাবি?

খাওয়া শেষে দুর্গা বলিল—হাঁড়িটা ফেলা হবে না কিন্তু, আবার আর একদিন বনভোজন কর্‌বো—কেমন তো? ওই কুলগাছটার ওপরে টাঙিয়ে রেখে দেবো?

অপু বলিল—হ্যাঁ, ওখানে থাকবে কিনা? মাতোর মা কাঠ কুড়ুতে আসে, দেখতে পেলে নিয়ে যাবে দিদি—ভারি চোর—

একটা ভাঙা পাঁচিলের ঘুলঘুলির মধ্যে ছোবাটা দুর্গা রাখিয়া দিল।

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুশীলনী

১। অপু, দুর্গা কি ভাবে চড়ুই ভাতির আয়োজন করিল তাহা বর্ণনা কর।

২। পল্লীগ্রামের বনজঙ্গলের যে পরিবেশের মধ্যে বনভোজনের আয়োজন হইয়াছিল তাহা বর্ণনা কর।

৩। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—উজ্জ্বল, পরিষ্কার, জঙ্গলাকীর্ণ।

৪। শব্দার্থ লিখ :- খেলাঘর, ছোবা, নিরালা, নিভৃত, ফরমাইজ, অংশীদার, দ্বিধামিশ্রিত, সমবয়সী, উপকরণ, শিল্প-সৃষ্টি।

৫। পদ পরিবর্তন কর :—

অপহৃত, চোর, বন, পরিষ্কার, তেল, ভাত, উপভোগ।

৬। বিপরীত পদ লিখ : - ছোট, নূতন, ভাঙা, আনন্দ, হাসি।

৭। বাক্য গঠন কর :—সাদাসিধা, ভাবভঙ্গী, কথাবার্তা, চুপিচুপি, বানাই, সত্যকার, সম্ভবপর।

৮। কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :—

(ক) **গোরুটোরুতে** খেয়ে ফেলে না।

(খ) আমি **চাল** বের করে নিয়ে আসি।

(গ) সে চুপি চুপি **তেলের ভাঁড়টা হইতে** বাহির করিয়া আনিল।

(ঘ) দুর্গা **তেলটুকু** দিয়া বেগুন ভাজে।

(ঙ) দুর্গা খুশির **হাসি** হাসিল।

এভারেষ্ট বিজয়

ভারবাহী শেরপাদের বাদ দিয়া হিমালয়ের এই শেষ অভিযানে কর্ণেল হাণ্টের নায়কত্বে তের জন নির্ব্বাচিত পর্বত-আরোহী ছিলেন। এই তের জনের মধ্যে একজন হলেন ভারতীয়—তেনজিং আর দুজন হলেন নিউজিল্যাণ্ডবাসী, বাকী সকলেই ইংরেজ।

এভারেষ্ট অভিযানের যাত্রাকেন্দ্র হল—নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু। এখানেই নানা দিক থেকে অভিযাত্রীরা সকলে এসে মিলিত হলেন এবং এখান থেকেই কুলীদের সংগ্রহ করা হয়। আগেকার অধিকাংশ অভিযানের মত এই অভিযানও 'আলপাইন ক্লাব' আর ইংলণ্ডের জগদ্বিখ্যাত রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির যুক্ত তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়।

ইতিমধ্যেই তেনজিংয়ের কাছে আমন্ত্রণ পত্র পৌঁছে গিয়েছিল। তেনজিংকে বাদ দিয়ে কোন এভারেষ্ট অভিযানই গঠিত হতে পারে

.C.E.R.T., West Benga
Date............13-1-92
Acc. No....5038....

না। কিন্তু সুইস অভিযান ফিরে আসার সংগে সংগেই তেনজিং অতি কঠিন ম্যালেরিয়া রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তাঁর শরীর রীতিমত তুর্ব্বল হয়ে যায়। কিন্তু এভারেষ্টের আমন্ত্রণ পাওয়ার সংগে সংগে তিনি দেহ-মন থেকে সমস্ত জড়তা ঝেড়ে ফেলেন। ঘরের শান্ত স্নিগ্ধ, মমতাময় জীবনকে পিছনে ফেলে রেখে তিনি ছুটলেন মৃত্যুসংকুল সেই ভয়ঙ্করের পথে।

ভয়ঙ্কর যাদের ডাকে, কোন বন্ধনই আর তাদের ধরে রাখতে পারে না। তিনি কাঠমাণ্ডুতে এসে অভিযাত্রীদের সংগে যোগদান করলেন এবং প্রথমেই কর্ণেল হাণ্টকে জানালেন, তিনি এই অভিযানে যোগদান করবার জন্যই এসেছেন, কিন্তু একটা শর্ত আছে. সে শর্ত মেনে না নিলে তিনি এই অভিযানে যোগদান করবেন না। সে শর্ত হল, তাঁকে পুরোপুরি অভিযাত্রী বলে মেনে নিতে হবে এবং যদি তিনি সক্ষম হন তাহলে তাঁকে একাই এভারেষ্ট চূড়ার দিকে অগ্রসর হবার অধিকার দিতে হবে।

কাঠমাণ্ডুর ব্রিটিশ এমবেসীতে এই নিয়ে সভা বসল এবং সভায় স্থির হল তেনজিংয়ের শর্ত স্বীকার করা হবে। তেনজিং আনন্দে অভিযানের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। চারদিক থেকে কুলীরা আসতে লাগল। তেনজিং তাদের ভেতর থেকে লোক বাছাই করতে লাগলেন।

সমস্ত আয়োজন শেষ হয়ে গেলে তুই দলে অভিযানকে ভাগ করা হল। প্রথম দলে রইলেন ন'জন যাত্রী আর রইল একশ বাষট্টি জন ভারবাহী আর আঠার জন শেরপা। দ্বিতীয় দলে রইলেন স্বয়ং কর্ণেল হাণ্ট আর তিনজন অভিযাত্রী, সংগে থাকলো তু'শো জন ভারবাহী আর তু'জন শেরপা। সমস্ত মালের ওজন হল সতের শ'পাউণ্ড।

কাঠমাণ্ডু থেকে অভিযান যাত্রা করল নাম্‌চে বাজারের দিকে—কাঠমাণ্ডু থেকে একশো সত্তর মাইল দূর। এই নামচে-বাজার থেকে প্রকৃতপক্ষে শুরু হল আসল অভিযান। এই একশো সত্তর মাইল পথ এত দুরূহ আর দুর্গম যে অভিজ্ঞ নেপালী শেরপারা ছাড়া এই পথ দিয়ে কেউ অগ্রসর হতে পারে না। অন্য পথ দিয়ে অবশ্য নাম্‌চে-বাজারে পৌঁছান যায় কিন্তু তাতে সময় লাগে ঢের বেশী।

থায়াংবক থেকে সুরু হয়েছে এভারেষ্টের তুষারক্ষেত্র। একটা বিরাট গ্লেশিয়ারের প্রান্তেই থায়াংবক। এখানে সমস্ত অভিযান তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করে রইল। কারণ এখানে হিমালয়ের তুহিন-প্রকৃতির সংঙ্গে অভিযাত্রী আর শেরপাদের নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলতে হয়। তাছাড়া, এইখান থেকেই শুরু হয় পথঘাট জরিপ করে দেখা, নতুন কোন ভাল পথ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। সামনের পথের অবস্থা কিরকম, পরবর্ত্তী তাঁবু কোন্ জায়গায় স্থাপন করা সম্ভব হবে,— সব এইখান থেকেই নির্ধারিত হয়।

থায়াংবকে এক বৌদ্ধ মঠ আছে। ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়, হিমালয়ের এই দূর দুর্গমতার মধ্যে অনন্ত তুষারের রাজ্যও সর্ব্বত্র মঠ আর মন্দির আছে, আর সেই মঠ ও মন্দিরে যুগ-যুগান্ত ধরে ইষ্ট-দেবের আরাধনা চলেছে।

থায়াংবক মঠের সামনে থেকেই শুরু হয়েছে বিশাল খুম্বু গ্লেশিয়ার বা হিমবাহ। এই হিমবাহ পেরিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

এইখান থেকে বাতাস খুব পাতলা হয়ে আসে। তাই এখানে বাস করে এই পাতলা বাতাসকে সহ্য করে নিতে হয়।

আটাশে তেনজিং আর হিলারী সাত নম্বর তাঁবু থেকে যাত্রা করলেন। তাঁরা ঠিক করলেন সোজা এভারেষ্টের চূড়ার দিকে অগ্রসর

না হয়ে তাঁরা যত উঁচুতে পারেন গিয়ে এমনভাবে আট নম্বর তাঁবু ফেলবেন যাতে রাত্রির বিশ্রামের শেষে পরের দিন সকাল বেলায় তাঁরা শেষ তিনশ কি সাড়ে তিনশ ফুট জয় করে ফিরে আসতে পারেন। এই উচ্চতায় তাঁদের সঙ্গে আর একজন তরুণ শেরপাও এসেছিল তার নাম আংগনিমা। তাঁদের তুজনকে সাহায্য করবার জন্য গ্রেগরী, লাওয়ি আর আংগনিমাকে পাঠান হয়।

সাত নম্বর তাঁবু থেকে পথ প্রায় খাড়া উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। প্রত্যেক পদে নিজের হাতে বরফ কেটে ধাপ তৈরী করে সেই খাড়া পথে যেতে গিয়ে তাঁদের তু-জনেরই মেরুদণ্ড যেন ভেঙে পড়তে লাগল। তারপর তাঁরা ভীত হয়ে দেখলেন তাদের অক্সিজেন যন্ত্রের অক্সিজেন প্রয়োজনীয় মাত্রা থেকে অনেক কমে গিয়েছে। তখন বাধ্য হয়ে তাঁরা কম মাত্রায় অক্সিজেন নিতে লাগলেন।

কিন্তু সেই খাড়া পাহাড়ের গায়ে কোথাও এতটুকু তাঁবু ফেলবার মতন সামান্য জায়গাও পাওয়া গেল না। গত বছর তেনজিং সুইস অভিযাত্রীদের সংগে এই পথেই এসেছিলেন। সেই সময় তিনি একটা জায়গা লক্ষ্য করেছিলেন। বহু খোঁজাখুঁজির পর তেনজিং সেই জায়গা খুঁজে বার করলেন এবং সাতাশ হাজার আটশো ফুট উঁচুতে আট নম্বর তাঁবু ফেলা হয়।

এর আগে এত উঁচুতে আর কোনও তাঁবু ফেলা হয়নি। এই তাঁবুতে কোনও রকমে একজন মানুষ ধরে। তেনজিং আর হিলারী সেই ছোট তাঁবুতে কোন প্রকারে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করলেন। সঙ্গে যে সাহায্যকারীরা এসেছিল, তারা ফিরে গেল। তেনজিং আর হিলারী সেই তুষার নীড়ে কম্পিত বুকে রাত প্রভাতের অপেক্ষায় রইলেন।

উনত্রিশে ভোর ছটা বাজতেই তেনজিং আর হিলারী শেষ অভিযানের জন্যে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। নটার সময়ে তাঁরা দক্ষিণ চূড়ায় এসে উঠলেন। সেখান থেকে এভারেষ্টের মূল চূড়া হল আর আধ মাইল মাত্র। সেখানে এসে মিনিট দশেক তাঁরা একটু বিশ্রাম করে নিলেন। মুখ থেকে অক্সিজেন নেবার মুখোশটা খুলে দেখলেন বিশেষ কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

অক্সিজেন যন্ত্রের দিকে চেয়ে তাঁরা ভীত হয়ে উঠলেন। যেটুকু অক্সিজেন আছে, তা মোটেই পর্য্যাপ্ত নয়। স্বাভাবিক মাত্রায় যদি নেওয়া হয় তাহলে চূড়ায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই তা ফুরিয়ে যাবে। তখন হিসেব করে তাঁরা অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে দিলেন। তাতে অবশ্য নিঃশ্বাস নিতে একটু অসুবিধা হতে লাগল। কিন্তু দুর্জয় পণ যাঁদের মনে তাঁরা সব অসুবিধার উপর গিয়ে দাঁড়াতে পারেন।

সেখান থেকে আধ মাইল পথ অতিক্রম করতে আড়াই ঘণ্টা লাগল। সাড়ে এগারটার সময়ে তেনজিং এভারেষ্টের চুড়ায় গিয়ে উঠলেন, তারপর হিলারীকে হাত বাড়িয়ে উপরে তুলে নিলেন। পঞ্চাশ বছর ধরে মানুষের অবিরাম অবিশ্রান্ত সাধনা সেদিন জয়যুক্ত হল।

এভারেষ্টের চূড়ায় কে প্রথম উঠেছিলেন, এই নিয়ে বহু বাদানুবাদ হয়। একথা নিঃসন্দেহ যে, তেনজিং প্রথম এভারেষ্টের চূড়ায় পদার্পণ করেন।

চূড়ায় পদার্পণ করে তেনজিং নতজানু হয়ে ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করলেন—সঙ্গে যে চকোলেট আর বিস্কুট ছিল তারই অর্ঘ্য মাটিতে রেখে ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করলেন।

তারপর নেপাল আর ভারতের পতাকা সেখানে পুঁতলেন। ভারতের পতাকা তাঁকে কোন ভারতীয় নেতা বা ভারত রাষ্ট্রের

প্রতিনিধি দেননি, তাঁর এক বাঙালী বন্ধু একটি ছোট্ট ত্রিবর্ণ পতাকা তাঁর হাতে দেন। বন্ধুর সেই ছোট্ট পতাকাটুকু রাখল ভারত রাষ্ট্রের সম্মান।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

অনুশীলনী

১। এভারেষ্ট জয় করার জন্য প্রথম কি কি চেষ্টা করা হয় ?

২। তেনজিং কি ভাবে এভারেষ্ট বিজয়ে সার্থক হলেন ?

৩। এভারেষ্টের যাত্রাপথে যে দুর্গমতা তাহা নিজের ভাষায় লিখ।

৪। এভারেষ্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। শব্দার্থ লিখ :—অভিযান, নির্বাচিত, আমন্ত্রণ, মৃত্যুসংকুল, আরাধনা, নির্ধারিত, শয্যাশায়ী, তুষারনীড়ে, মমতাময়।

৬। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :—

হিমালয়, অধিকাংশ, পদার্পণ, বাদানুবাদ, তত্ত্বাবধান।

৭। পদ-পরিবর্তন কর :—

বিশাল, জড়তা, স্নিগ্ধতা, নিবেদন, সম্মান, রাষ্ট্র, স্বাভাবিক।

৮। বিপরীত পদ লিখ :—

পাতলা, সহ্য, অনন্ত, কঠিন, শান্ত, সক্ষম, স্বীকার।

৯। বাক্য গঠন কর :—

পুরোপুরি, আত্মনিয়োগ, ভারবাহী, প্রকৃতপক্ষে, জরিপ, প্রতিনিধি।

১০। কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :—

(ক) কোন বন্ধনই **তাদের** ধরে রাখতে পারে না।

(খ) **চারদিক** থেকে কুলীরা আসতে লাগল।

(গ) এই **হিমবাহ** পেরিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

(ঘ) তেনজিংই প্রথম এভারেষ্টের **চূড়ায়** পদার্পণ করেন।

(ঙ) তারই অর্ঘ্য মাটিতে রেখে **ইষ্টদেবতাকে** নিবেদন করলেন।

লজ্জাবতী ও বনচাঁড়াল প্রভৃতি কতকগুলি গাছ আছে, তাদের গায়ে হাত দিলে বা উত্তাপ লাগাইলে ঐ সকল গাছের ছোট ছোট পাতা গুটাইয়া যায়, পাতার ডাঁটাও নামিয়া পড়ে। নারিকেল, তাল, আম, জাম গাছে এরকম কিছু দেখা যায় না। এই সব দেখিয়া উদ্ভিদবিশারদ পণ্ডিতগণ উদ্ভিদকে 'অসাড়' ও 'সসাড়' এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন। জগদীশচন্দ্র দেখাইলেন যে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ ভুল। প্রত্যেক গাছেই বাহিরের উত্তেজনায় সাড়া দেয়; তবে যে নারিকেল তাল প্রভৃতি উদ্ভিদে ঐ সাড়া দেখা যায় না, আর লজ্জাবতীতে দেখা যায়? তাহার কারণ এই যে, নারিকেল আম প্রভৃতি উদ্ভিদের গঠন এইরূপ যে উহাদের পক্ষে ডালপালা গুটানো সম্ভব নয়—উহাদের যেন হাত পা বাঁধা। কোন জন্তুকে আঘাত করিলে সে চীৎকার করিয়া হাত-পা ছুঁড়ে; এক বোবা জন্তুকে যদি হাত-পা বাঁধিয়া মারা যায় তবে তো সে কোনো সাড়া দিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু তাঁহার বেদনার অনুভূতি তো সমভাবে প্রবল থাকে। উদ্ভিদ মাত্রই যদি বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেয় তবে কি উপায়ে উহা বুঝা যাইবে?

ইহার পূর্ব হইতে বিজ্ঞানী দেখিয়াছিলেন যে, প্রাণিদেহের কোনো স্থানে যদি আঘাত করা যায় তো একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ সেই আহত স্থান হইতে চারিদিকে প্রবাহিত হয়। উদ্ভিদদেহেও জগদীশচন্দ্র এইরূপ সাড়ার অনুসন্ধান করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, কি

লজ্জাবতী লতা, কি তাল তমাল, আঘাত করিলে প্রত্যেক উদ্ভিদে আহত স্থান হইতে সুস্থ স্থানে একটি তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চালিত হয় এবং আঘাতের মাত্রা যত বেশি হয় তড়িৎ প্রবাহ তত প্রবল হয়, প্রাণিদেহে যেরূপ হইয়া থাকে।

তড়িৎ প্রবাহরূপ পরোক্ষ সাড়া যেন সকল উদ্ভিদে সমান হইল, কিন্তু প্রত্যক্ষ সাড়া সম্বন্ধে পার্থক্য দেখা যায় কেন? কেনই বা লজ্জাবতী পাতা নামাইয়া সাড়া দেয় এবং আম জাম দেয় না? জগদীশচন্দ্র দেখিলেন যে একটি লজ্জাবতী লতার যেখানে ডাল বাহির হইয়াছে তথায় পেশী একদিকে আছে, আহত হইলে পেশী সংকুচিত হয়, ডালটি নামিয়া পড়ে। সাধারণ বৃক্ষে ঐ স্থানে পেশী চারিদিকেই আছে। চারিদিকে সমভাবে সংকুচিত হওয়ায় ডাল নামে না। তিনি একটি সাধারণ উদ্ভিদ লইলেন এবং ঐরূপ স্থানে পেশীর একদিকে ক্লোরোফরম দিয়া অসাড় করিয়া দিলেন। এইবার পরীক্ষায় দেখাইলেন যে এই সাধারণ গাছ যাহাকে এতদিন অসাড় উদ্ভিদ বলা হইত, উহাও লজ্জাবতীর ন্যায় ডাল নোয়াইয়া সাড়া দিল।

—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

অনুশীলনী

১। "জগদীশচন্দ্র দেখাইলেন যে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ ভুল।" জগদীশচন্দ্র কিরূপে কাহার ভুল দেখাইলেন আলোচনা কর। ২। উদ্ভিদে প্রত্যক্ষ সাড়া সম্বন্ধে পার্থক্য দেখা যায় কেন? ৩। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। ৪। শব্দার্থ লিখ :- উত্তেজনা, প্রবাহ, সঞ্চালিত, প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, বিজ্ঞানী, উদ্ভিদ-বিশারদ। ৫। বাক্য গঠন কর :- সাড়, পেশী, সমভাব, চারিদিকে, সংকুচিত, সসাড়, অনুভূতি। ৬। বিপরীত শব্দ লিখ :—অসাড়, সক্ষম, পরোক্ষ, পার্থক্য, সংকুচিত। ৭ কারক ও বিভক্তি লিখ :- (ক) উহাদের পক্ষে **ডালপালা** গুটানো সম্ভব নয় (খ) সাধারণ বৃক্ষে পেশী চারিদিকে আছে। (গ) বিদ্যুৎতরঙ্গ সেই আহত **স্থান** হইতে প্রবাহিত হয়। ৮। পদ পরিবর্তন কর— উত্তাপ, অনুভূতি, উত্তেজনা, প্রবল, পার্থক্য, সংকুচিত।

দেশবন্ধুর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের সকল কথা আমি অবগত নই। জীবনচরিতের মধ্যে যে সব কথা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও বোধহয় আমি জানি না। তাঁহার জীবনের মাত্র তিন বৎসর কালআমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম এবং অনুচর হইয়া তাঁহার কাজ করিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যেও চেষ্টা করিলে তাঁহার নিকট অনেক কিছু শিখিতে পারিতাম, কিন্তু চোখ থাকিতে কি চোখের মূল্য বুঝি? বিশেষতঃ দেশবন্ধু সম্বন্ধে আমার ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অন্ততঃ আরও কয়েক বৎসর জীবিত থাকিবেন এবং তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন না হওয়া পর্যন্ত তিনি মর্ত্যলোকের কর্মভূমি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন না।...

জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধুর অতুলনীয় অলৌকিক প্রভাবের গূঢ় কারণ কি, অনেকে এ প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি সর্বপ্রথমে অনুচর হিসাবে তাঁহার ভাবের একটি কারণ নির্দেশ করিতে চাই। আমি দেখিয়াছি তিনি সর্বদা মানুষের দোষগুণ বিচার

না করিয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারিতেন। তাঁহার ভালবাসার উৎপত্তি হৃদয়ের সহজ প্রেরণা হইতে; সুতরাং তাঁহার ভালবাসা গুণীর গুণের উপর নির্ভর করিত না। যাঁহাদিগকে আমরা সাধারণতঃ ঘৃণায় ঠেলিয়া ফেলি, তিনি তাহাদিগকে বুকে টানিয়া লইতে পারিতেন। কত বিভিন্ন রকমের লোক তাঁহার হৃদয়ের টানে তাঁহার নিকট আসিত এবং জীবনের কত ক্ষেত্রে এই নিমিত্ত তাঁহার প্রভাব ছিল। সমুদ্রে প্রকাণ্ড ঘূর্ণাবর্তের ন্যায় এই বিপুল জনসমাজে তিনি চারিদিক হইতে প্রাণকে আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন, এরূপ কত দৃষ্টান্ত এখন চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। যাঁহারা তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিকট মাথা নত করেন নাই, অসাধারণ বাগ্মিতায় বশীভূত হয়েন নাই, বিক্রমের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই, অলৌকিক ত্যাগে মুগ্ধ হয়েন নাই তাঁহারা পর্যন্ত ঐ বিশাল হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আর তাঁহার সহকর্মীরা ছিলেন তাঁহার পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত। তিনি উপকার অথবা মঙ্গলের জন্য কি না করিতে প্রস্তুত ছিলেন? জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না—একথা একশো বার সত্য। দেশবন্ধুর জীবন ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাঁহার অনুচরবর্গ এবং তাঁহার সহকর্মীগণ তাঁহার আদেশে কি না করিতে পারিতেন? কোনও ত্যাগ, কোনও কষ্ট, কোন পরিশ্রম কি তাঁহাদের বিচলিত করিতে পারিত? অবশ্য জীবনদানের পরীক্ষা কোনদিনও হয় নাই—কিন্তু সেকথা বাদ দিলে বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে অনুচরবর্গ তাঁহার কাজ করিতে গিয়া সানন্দে সকল প্রকার দুঃখ ও কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহাতে গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু জানিতেন যে, তাঁহার অহিংস সংগ্রামে এমন

কতকগুলি সৈনিক আছে, যাহাদের উপর তিনি সর্বাবস্থায় নির্ভর করিত পারেন। আজ আমি গর্বের সহিত বলিতে পারি দেশবন্ধুর পুণ্য জীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত তাঁহার শান্তিসেনা অটলভাবে সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছেন।

যাঁহারা ভিতরের খবর রাখেন না তাঁহারা দেশবন্ধুর সংঘ গঠনের অপূর্ব শক্তি দেখিয়া বিমোহিত হইতেন—হইবারও কথা। কারণ দেশবন্ধু যাহা দেখাইয়া গেলেন তাহা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন। আমি এস্থলে নিঃস্কোচে বলিতে পারি তিনি পর্বতের ন্যায় যে অটল সংঘ গঠন করিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল নায়ক ও অনুচরবর্গের মধ্যে প্রাণের সংযোগ। ইহা ব্যতীত দোষগুন-নির্বিশেষে ভালবাসিবার ক্ষমতার সাহায্যে এবং অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলের দ্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন পন্থী ও রুচির লোকদিগকে একত্র চালাইতে পারিতেন। তাঁহার দলের অন্তর্ভুক্ত নহেন অথবা তাঁহার মত পোষন করেন না এরূপ বহুলোক গোপনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।

—সুভাষচন্দ্র বসু

অনুশীলনী

১। জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধুর অতুলনীয় প্রভাবের কারণ কি ?

২। দেশবন্ধুর সংঘ সংগঠন-শক্তির পরিচয় লিপিবদ্ধ কর।

৩। এই নিবন্ধ অবলম্বন করিয়া দেশবন্ধুর চরিত্র বর্ণনা কর।

৪। শব্দার্থ লিখ :—

বৈচিত্র্যপূর্ণ, উদ্‌যাপন, কর্মভূমি, অতুলনীয়, অলৌকিক, বাগ্মিতা নিঃসঙ্কোচে, গূঢ়, ব্রত।

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ কর—

ঘূর্ণাবর্ত, পরীক্ষা, অন্তর্ভুক্ত, প্রত্যক্ষ, নির্বিশেষ, সর্বাবস্থা।

৬। বাক্যগঠন কর :—

অন্ততঃ, সাধারণতঃ, প্রাণপণ, দৃষ্টান্ত, সানন্দে, তুচ্ছ, বিশেষতঃ, মর্ত্যলোক।

৭। বিপরীত শব্দ লিখ :—

উৎপত্তি, পরাজয়, অহিংস, নূতন, প্রত্যক্ষ, দুঃখ, কষ্ট, বিশাল।

৮। পদ পরিবর্তন কর :

গুণী, পরিশ্রম, নির্ভর, বিশাল, প্রস্তুত, অটল, ত্যাগ, কৌশল।

৯। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :—

(ক) চোখ থাকিলে কি চোখের **মূল্য** বুঝি।

(খ) তাঁহার ভালবাসার উৎপত্তি হৃদয়ের সহজ **প্রেরণা** হইতে।

(গ) বিশাল **হৃদয়ের দ্বারা** আকৃষ্ট হইয়াছেন।

(ঘ) **সমুদ্রে** প্রকাণ্ড ঘূর্ণাবর্তের ন্যায়……তিনি প্রাণকে আকর্ষণ করিতেন।

(ঙ) তাঁহার **আদেশ** প্রতিপালন করিয়াছেন।

শিল্পনগরীর জন্মকথা

দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিমবঙ্গ ছিল একটিমাত্র শিল্পনগরী নির্ভর। কলকাতা ছাড়া, এরাজ্যে প্রায় সব এলাকাই ছিল অনগ্রসর। স্বাধীনতার পরে বেশ কিছু সংখ্যক ভারী ও মৌল শিল্প নিয়ে গড়ে ওঠে এ রাজ্যের দ্বিতীয় শিল্পনগরী দুর্গাপুর আসানসোল এলাকায়। এর পরে প্রায় আরো দুটি দশক অতিক্রান্ত হতে চলল। সমস্যাসংকুল পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত করার তাগিদে আজ কলকাতা থেকে দেড়শ কিলোমিটার দূরে গড়ে উঠেছে রাজ্যের তৃতীয় শিল্পনগরী। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ প্রান্তে হুগলী নদী ও হলদি নদীর সঙ্গম-স্থলে হলদিয়া এখন এক অবিশ্রান্ত কর্মকোলাহলে পূর্ণ নূতন শিল্পনগরী।

এখনকার কর্মচঞ্চল হলদিয়া মাত্র পনের বছর আগেও ছিল জেলে আর ছোট চাষীদের নিস্তরঙ্গ সত্তরটি গ্রামের সমষ্টি। এখন চেহারা একেবারেই বদলে গেছে, চারিদিকে কর্মোৎসাহের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে দ্রুতগামী জীপ ও লরিগুলি ধুলো উড়িয়ে ছুটে ছুটে চলেছে। এখানে সুবৃহৎ ডক ও বহুতর শিল্পসমষ্টির যে নূতন সদাচঞ্চল কর্মকেন্দ্র

গড়ে উঠেছে তার জন্মলগ্নে এখনও দেখা যায় অতীত পল্লীজীবনের অবশিষ্ট খালের তীরে বাঁধা আছে জেলেদের ডিঙ্গি নৌকা। যাত্রী বোঝাই নৌকা চলেছে স্রোত বেয়ে, মাঝি উনোনে তার রান্না চাপিয়েছে। তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে একপায়ে, কাঁটাগাছের বেড়া, ভূতুড়ে বাড়ির ভগ্নাংশ, এক নির্জন লাইট হাউস টাওয়ার, যেটা অনেকদিন আগেই তার ভূমিকা হারিয়েছে। প্রায় চৌদ্দশ একর আয়তন জুড়ে সম্প্রতি পেছনে ফেলে আসা শ্রান্ত গ্রাম্য পরিবেশে জন্ম নিচ্ছে এক বিরাট কর্মপ্রবাহের সদাব্যস্ত সমারোহ কেন্দ্র।

যে তিনটি প্রধান শিল্পগোষ্ঠিকে ঘিরে এখানে এক বিশাল শিল্প-কেন্দ্র ধীরে ধীরে উন্মেষ লাভ করছে সেগুলি হল -হলদিয়া বন্দর, হলদিয়া সার প্রকল্প ও তৈল শোধনাগার। এই তিনটি প্রকল্পের সঙ্গে সঙ্গেই বহু ছোট ছোট শিল্পসম্ভাবনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত এমন কি তার পরেও কলকাতা বন্দর ছিল ভারতের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। দেশের সবচেয়ে বেশি পণ্য চলাচল করত কলকাতা বন্দর দিয়ে। কিন্তু নানা কারণে আজ কলকাতা বন্দরের এই প্রাধান্য হ্রাস পেয়েছে। হলদিয়ায় পরিপূরক বন্দর স্থাপনের উদ্দেশ্য হল দুটি—যে সব ভারী ও বড়ো বড়ো জাহাজগুলি কলকাতায় আসতে পারছে না, সেগুলি সেখানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা ; আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে কলকাতা বন্দরের উপর যে চাপ পড়ছিল তা পরিপূরক বন্দরের মাধ্যমে কমিয়ে ফেলা। বর্তমানে সারা বিশ্বে বন্দর পরিকল্পনার অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে, বন্দর প্রকল্পের ভেতরে বড়ো বড়ো শিল্প কারখানা গড়ে তোলা। এতে ঐসব শিল্পকারখানার পণ্য ঐ বন্দর দিয়ে চলাচলের সুবিধা পায়। হলদিয়ায় একটি তৈল শোধনাগার ও একটি সার কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে।

বিদেশ থেকে পরিশোধিত তেল আমদানী করার চেয়ে অপরিশোধিত তেল আমদানী করে, তা পরিশোধন করে নিলে খরচ অনেক বাঁচে। এই কারণে দেশে একাধিক তৈল শোধনাগার স্থাপনের প্রয়োজন। হলদিয়ায় সার কারখানা চালু হবার সময় নাগাদ ভারতে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম সার-শিল্প গড়ে উঠবে। সার-শিল্প শস্য উৎপাদন বাড়িয়ে দেশে খাদ্য সমস্যা মেটাতে সাহায্য করে, অনেককে চাষ করতে উৎসাহ দেয়। হলদিয়ায় একটি জাহাজ নির্মাণের কারখানা ও তৈলজাত রাসায়নিক পণ্য উৎপাদনের কারখানা নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে। তাছাড়া বন্দরভিত্তিক আরও কিছু শিল্পকারখানা হলদিয়া বন্দরে গড়ে উঠেছে। বস্তুত হলদিয়াকে কেন্দ্র করে জন্ম নিচ্ছে তৃতীয় শিল্পনগরী ॥

(সংকলিত ও পুনর্লিখিত)

অনুশীলনী

১। পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় শিল্প নগরী কোথায় জন্ম নিচ্ছে ? কীভাবে তা ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছে বর্ণনা কর। ২। নির্মীয়মান শিল্পনগরীর কাছে তার অতীত কালের কী কী চিহ্ন এখনও দেখা যায়। ৩। কোন্ কোন্ শিল্প কারখানা হলদিয়ায় গড়ে উঠছে তার বিবরণ দাও। ৪। শব্দার্থ লিখ—কর্মকোলাহল, সমস্যাসঙ্কুল, প্রকল্প, পরিপূরক, আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা, শিল্পনগরী, আয়তন। ৫। সন্ধিবিচ্ছেদ কর : অনগ্রসর, ত্বরান্বিত, নিস্তরঙ্গ, সমারোহ, অঙ্গাঙ্গী, শোধনাগার, কর্মোৎসাহ, চলাচল, ভগ্নাংশ। ৬। পদ পরিবর্তন কর :— অতিক্রান্ত, অবিশ্রান্ত, মৌল, প্রাধান্য, পরিশোধিত, রাসায়নিক, উদ্যোগ। ৭। বাক্য রচনা কর : এলাকা, মৌল, সঙ্গমস্থলে, ভূমিকা, মাধ্যমে, সম্প্রতি, আমদানি, অপরিহার্য। ৮। কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর : (ক) খালের **তীরে** বাঁধা আছে জেলেদের ডিঙ্গি নৌকা। (খ) **খরচ** অনেক বাঁচে। (গ) শিল্পকেন্দ্র ধীরে ধীরে **উন্মেষ** লাভ করছে। (ঘ) তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে **একপায়ে**।

বুদ্ধদেব

এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে আমাদের দেশে এমন একজন মহাপুরুষ জন্মেছিলেন যাঁর নাম এশিয়ার প্রত্যেক দেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর ধর্ম এক সময়ে পৃথিবীর এত লোক মেনে নিয়েছিল যা অন্য কোন ধর্মের ভাগ্যে ঘটেনি। সেই মহাপুরুষ বুদ্ধদেব।

বুদ্ধদেবের ছোটবেলার নাম ছিল সিদ্ধার্থ। তাঁকে অনেকে গৌতম বলেও ডাকত, কারণ তাঁদের গোত্র ছিল গৌতম।

সিদ্ধার্থের বয়স তখন মাত্র উনত্রিশ বৎসর। তিনি এক গভীর রাত্রিতে রাজপুরীর সমস্ত আকর্ষণ কাটিয়ে গৃহত্যাগ করলেন। বেশভূষা পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসীর বেশ নিলেন, নিজের হাতে মাথার চুল কেটে ফেললেন। রাজপুত্রের কোন চিহ্নই আর তাঁর থাকল না। এই বেশে তিনি নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে এমন একজন গুরু খুঁজতে লাগলেন যিনি তাঁকে সত্যকার জ্ঞান দিতে পারেন। সিদ্ধার্থ সে গুরু পেলেন না।

তখন তিনি গয়ায় নৈরঞ্জনা নদীর ধারে এক অশ্বত্থগাছের নীচে আশ্রয় নিলেন। সেখানে গভীর ভাবে ধ্যানধারণা করে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন। এই দিব্যজ্ঞানকে বলা হয় বোধি। বোধি লাভ করলেন বলে সিদ্ধার্থের তখন নাম হল বুদ্ধ। যে অশ্বত্থগাছের নীচে এই জ্ঞান লাভ করলেন লোকে তার নাম দিল বোধিবৃক্ষ গয়ার যে অংশে তিনি সাধন করেন তাকে এখন সকলে বুদ্ধগয়া বলে।

সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হয়ে নূতন ধর্ম প্রচার করলেন। তিনি বললেন যাগযজ্ঞ পশুবলিদান এবং মন্ত্রপাঠ করলেই ধর্ম হয় না, সত্যজ্ঞান লাভ হয় না। মনকে সুপথে চালাতে পারলেই সে জ্ঞান পাওয়া যায়। হিংসা, দ্বেষ, লোভ এসব ত্যাগ করতে হবে। সবাইকে সমান ভালবাসতে হবে। সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য নিজের স্বার্থ এমন-কি জীবনও দান করতে হবে। লোভ, হিংসা এইসব থাকার জন্য আমাদের মন সংসারের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। সেই-সবের উপর উঠতে পারলে মানুষ দিব্যজ্ঞান লাভ করতে পারে—সে ব্রাহ্মণই হোক আর অন্য জাতিই হোক।

বুদ্ধের এই বাণী সকলের হৃদয় স্পর্শ করল। দিব্যজ্ঞান লাভ করবার বা বড়ো হবার দাবি যে উঁচুজাতি ছাড়া অন্য সকলেও করতে পারে—এ কথা তারা এই প্রথম শুনতে পেল। তারা তাঁর শিক্ষায় বুঝতে পারল যে, মানুষই তার কর্মগুণে দেবতার মতো হয়, তখন সে হয় আদর্শ পুরুষ। দেবতার যত গুণ তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। সেই সব গুণ লাভ করাই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় আদর্শ।

বুদ্ধদেবের এই আদর্শ দেশের লোককে এমন ভাবে আকৃষ্ট করল যে, দলে দলে লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে লাগল। রাজা-জমিদারেরা তাঁর এই নূতন ধর্মের অনুরাগী হলেন। দেশময় বুদ্ধের বাণী ছড়িয়ে পড়ল।

আশি বৎসর বয়সে বুদ্ধদেবের মৃত্যু হয় বিহারে কুশীনগর নামক স্থানে, এক শালবনের মধ্যে। তাঁর মৃত্যু সংবাদে রাজা প্রজা সকলেই শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ভস্মশেষ আটজন রাজা ভাগ করে নিজে নিজের রাজ্যে নিয়ে যান এবং স্তূপ নির্মান করে সেই ভস্ম রক্ষা করেন। বুদ্ধদেবের মৃত্যু হল বটে কিন্তু তাঁর চরিত্র

চিরস্মরণীয় হয়ে থাকল। তাঁর বাণী আমাদের দেশের প্রত্যেকের মনে স্থান পেল।

শুধু যে আমাদের দেশেই এ ধর্ম প্রসার লাভ করেছিল তা নয়। কালক্রমে পারস্য, মধ্য-এশিয়া, চীন, জাপান, প্রভৃতি দেশেও এই ধর্ম ছড়িয়ে পড়ল। সমস্ত এশিয়ার প্রায় তিন-ভাগ লোক এই ধর্ম গ্রহণ করল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ত্যাগ ও সেবায় যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, সেই অতি প্রাচীন-কালে তেমন অন্য কেউ পারে নি। সেই কারণে বিদেশীরা পর্য্যন্ত এই ধর্মে শ্রদ্ধাবান।

— প্রবোধচন্দ্র বাগচী

অনুশীলনী

১। সিদ্ধার্থ কিজন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন ?

২। সিদ্ধার্থ কোথায় কি ভাবে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন ?

৩। বুদ্ধদেব যে নূতন ধর্ম প্রচার করলের তার মূল কথা কি ? তাঁর মৃত্যুর পর কোথায় কোথায় এই ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে ? এই ধর্মে বিদেশীরা পর্যন্ত কেন শ্রদ্ধাবান ?

৪। বুদ্ধের বাণী সকলের হৃদয় স্পর্শ করল কেন ?

৫। বুদ্ধের জীবন ও বাণী নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখ।

৬। পদান্তর কর :— ধর্ম, আকর্ষণ, চিহ্ন, স্বার্থ, শিক্ষা, স্পষ্ট।

৭। বাক্য গঠন কর :— বেশভূষা, ধ্যান-ধারণা, যাগযজ্ঞ, কর্মগুণে, রাজা-জমিদার।

৮। শব্দার্থ লিখ :—মহাপুরুষ, দিব্যজ্ঞান, বোধি, অভিভূত, চিরস্মরণীয়, ভস্মশেষ, স্তূপ, কালক্রমে।

৯। কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :—

(ক) তাকে এখনও **সকলে** বুদ্ধগয়া বলে। (খ) সকলেই **শোকে** অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। (গ) তিনি **দিব্যজ্ঞান** লাভ করলেন।

ভারতের কৃষি

সূর্যালোক, মাটি, জল, গাছ-পালা, জীবজন্তু ও মানুষই হল আমাদের কৃষির মূল সম্পদ। বর্ষাকাল ছাড়া প্রায় সব সময়ই আমরা সূর্যালোক প্রচুর পরিমাণে পেয়ে থাকি। ভারতের ভৌগলিক প্রকৃতি বিচিত্র। হিমালয়, আরাবল্লী, বিন্ধ্য এবং সাতপুরা পর্বত যেমন আছে, তেমনি আছে সুবিশাল সমভূমি, যাকে একাধিক নদী তাদের জল-দানে সতত সরস করে রেখেছে। আমাদের জলবায়ুতে বেশি রকমের তারতম্য আছে। একদিকে চরম-ভাবাপন্ন জলবায়ু থেকে সামুদ্রিক জলবায়ু, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে গরম আছে, আবার অপর দিকে তেমনি শুকনো মরুময় এলাকাও আছে যেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অত্যন্ত সামান্য ও অনিয়মিত। দেশের পলিমাটি আবৃত অঞ্চল সম্বন্ধে আমরা তবু কিছু জানি, কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের জলসম্পদ সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছু জানি না।

দেশে চার রকমের মাটি আছে—পলিমাটি, কালোমাটি, লালমাটি পাট্‌কিলে মাটি। এছাড়া আরও যা মাটি আছে সেগুলো হল বন, মরুভূমির মাটি, ক্ষারকীয় লবণাক্ত-এসিডযুক্ত মাটি। লালমাটির জমিতে জল নিষ্কাশনের বিশেষ সমস্যা নয়। এই ধরণের মাটিতে প্রধানত খরিফ শস্যেরই চাষ হয়ে থাকে। অল্প গভীরতার কালো

মাটিতে কেবল মাত্র খরিফ শস্যের চাষ হয়, আর বেশী গভীরতার কালো মাটিতে হয় রবিশস্যের চাষ। এই ধরণের মাটিতে জল নিষ্কাষণ ও ভূমিক্ষয় একটা বড়ো সমস্যা। তাই সেচের বন্দোবস্ত করার সময় এখানে জল নিষ্কাষণ ও ভূমি সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। পলিমাটি নদীর পলি থেকে তৈরী বলে পলির প্রধান গুণ এখানে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। উৎপাদন-ক্ষমতা এই মাটির এক স্বাভাবিক ধর্ম এবং ওই মাটি সেচ ও ভূগর্ভস্থ জল প্রয়োগের পক্ষে খুব উপযুক্ত। সিন্ধু, গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এই মাটি দেখা যায় বেশী।

পাটকিলে মাটির জমির অধিকাংশ উঁচুনীচু জায়গা। দাক্ষিণাত্যের পার্বত্য অঞ্চল, মহীশূর, কেরল, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, পূর্বঘাট অঞ্চল, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র ও আসামের কিছু অংশে এই ধরণের মাটি দেখা যায়। তামিলনাড়ু ও কেরলের উঁচু এবং নীচু উভয় জায়গায় পাটকিলে মাটি বেশ উর্বর। এখানকার নীচু জমিতে ধান এবং উঁচু জমিতে চা, কফি, রবার, সিঙ্কোনার চাষ হয়ে থাকে। এই সমস্ত অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জল কাজে লাগানোর বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

প্রধান প্রধান শ্রেণীর মাটিগুলি ছাড়াও লবণাক্ত ও ক্ষারকীয় মাটি যেসব জায়গা জুড়ে আছে তাতেও সমস্যা কম নয়। জলাভূমি আছে উড়িষ্যার সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন ও অন্যান্য অঞ্চলে, উত্তর বিহার, উত্তর প্রদেশের আলমোড়া জেলায় এবং তামিলনাড়ুর দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে; এবং মরুময় অঞ্চল আছে রাজস্থান, গুজরাট ও হরিয়ানার কিছু কিছু অংশে।

দেশের কৃষিকার্যের একটা বড় সমস্যা হল ক্রমবর্ধমান ভূমিক্ষয়ের সমস্যা, যার উৎপত্তি হয়েছে বনজঙ্গল সাফ করা, প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষবাস, এবং অসমান জমিতে চাষবাস এবং গো-মহিষাদি চারণ

থেকে। এই ভূমিক্ষয় রোধ করতে না পারলে জমির উর্বরা শক্তি রোধ সম্ভব নয়।

[সংক্ষেপিত]

—ডঃ এম. এস স্বামীনাথন

॥ অনুশালনী ॥

১। "ভারতের ভৌগোলিক প্রকৃতি বিচিত্র"—সংক্ষেপে লিখ।

২। "দেশে চার রকমের মাটি আছে"—প্রত্যেক প্রকার মাটির প্রকৃতি ও উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। দেশের কৃষিসমস্যার জন্যে ভূমিক্ষয় কতটা দায়ী? কোথা থেকে তার উৎপত্তি?

৪। শব্দার্থ লিখ :—সুবিস্তৃত, জলসম্পদ, খরিফ, ভূগর্ভস্থ।

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—সূর্যালোক, একাধিক, ভাবাপন্ন, নিষ্কাশন, অধিকাংশ।

৬। পদ পরিবর্তন কর :—উর্বর, প্রচণ্ড, স্পষ্ট, অঞ্চল, গভীরতা, সতত, সরস।

৭। কারক ও বিভক্তি লিখ :—

(ক) আমরা **সূর্যালোক** প্রচুর পরিমাণে পেয়ে থাকি (খ) পলিমাটি নদীর **পলি** থেকে তৈরি। (গ) উঁচু **জমিতে** চা, কফি, রবার, সিঙ্কোনার চাষ হয়ে থাকে। (ঘ) **ভূমিক্ষয়** একটা বড়ো সমস্যা।

পলাশীর প্রান্তরে স্বাধীনতা হারাইয়া ভারতবাসীর অন্তর আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতেছিল। একশত বৎসর পরে সিপাহী-বিদ্রোহ সেই ক্ষোভানলের একটি স্ফুলিঙ্গ। উহার ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দুঃশাসন রহিত হইল। কিন্তু ভারতবাসীর প্রাণে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দমিত হইল না। ব্রিটিশ শাসনবিরোধী খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ চারিদিকে মাথা নাড়া দিয়া উঠিল। ইংরাজী শিক্ষা ভারতীয়দের মনে জাতীয়তা-বোধের সঞ্চার করে। ইংরাজ রাজপুরুষদের বঞ্চনা ও পক্ষপাতমূলক আচরণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মন ক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নবজাগ্রত জাতীয়তা বোধ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেসের রূপ ধারণ করে। ইংরাজ শাসনের সমালোচনা, সরকারী অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ, জাতীয় অভাব-অভিযোগের প্রতিকার, দেশশাসনে দায়িত্ব লাভের দাবি প্রতিষ্ঠা—এইগুলি ছিল কংগ্রেসের উদ্দেশ্য।

বিশ শতকের প্রথমেই বড়লাট কার্জনের বঙ্গ বিভগের প্রস্তাবে

সংক্ষুব্ধ বঙ্গদেশে সুরু হইল স্বদেশী আন্দোলন। বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ—এই সংকল্পের মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনের ভাব-ধারায় সমগ্র বাংলার যুব-ছাত্র সমাজ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। স্বৈরাচারী ব্রিটিশ শাসকগণ আন্দোলন দমনে প্রয়োগ করিলেন চণ্ডনীতি। যুগান্তর, অনুশীলন সমিতি প্রভৃতি বিপ্লবী গুপ্তসমিতি অত্যাচারী শাসকদের শাস্তি দিবার জন্য গড়িয়া উঠিতে থাকে। বিপ্লবী দল সেকালের কলিকাতা চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ডের প্রাণনাশের সিদ্ধান্ত করিয়া দুঃসাহসিক কার্যের ভার অর্পণ করেন প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসুর উপর। কিন্তু তাঁহারা ভুলক্রমে কিংসফের্ডের পরিবর্তে মজঃফরপুরের মিঃ কেনেডির স্ত্রী ও কন্যার গাড়ীর উপর বোমা মারিয়া তাঁহাদের মৃত্যু ঘটাইলেন। প্রফুল্ল ধরা না দিয়া আত্মহত্যা করিলেন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়িয়া ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গাহিয়া অমর হইলেন। এই সময় সত্যেন ও কানাই নামে বিপ্লবী সমিতির দুইজন যুবক রাজ-সাক্ষী নরেন গোঁসাইকে জেল-হাসপাতালের মধ্যে হত্যা করেন। উভয়েরই বিচারে ফাঁসীর হুকুম হয়। বিপ্লবী সমিতির সংগঠকগণ অরবিন্দ ও তাঁহার ভাই বারীন্দ্র, অবিনাশ, উল্লাসকর প্রভৃতি পুলিশের হাতে ধরা পড়িলেন। বিখ্যাত আলীপুর বোমার মামলা নামক বিচারে তাঁহাদের অভিযুক্ত করা হয়। কাহারও ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞা হয়, কেহ বা নির্বাসিত হন। অরবিন্দের পক্ষে এই মামলা পরিচালনা করেন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁহার যুক্তি-কৌশলে অরবিন্দ নির্দোষ প্রমাণিত হইয়া মুক্তি পান। কিন্তু ব্রিটিশের ফাঁসীর মঞ্চ বা নির্বাসন মাতৃমন্ত্রী স্বাধীনতার যোদ্ধাদের মুক্তিপ্রেরণা অবদমিত করিতে পারিল না। বাঘা যতীন ও তাঁহার চারজন সঙ্গী বালেশ্বরের নিকট কোপতি-পোদার জঙ্গলে

আত্মগোপন করিয়া সশস্ত্র পুলিশের সহিত যুদ্ধ করেন। তিনি পুলিশের গুলিতে জীবনদান করেন। কিন্তু বাঙালী যুবকদের ট্রেঞ্চে থাকিয়া প্রাণপ্রণে যুদ্ধ করিবার সাহস টেগার্ট সাহেবকেও বিস্মিত করিয়া দেয়।

স্বাধীনতার সাধনায় নূতন পথের নির্দেশ দিয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি হিংসার বদলে অহিংস সত্যাগ্রহের আদর্শ স্থাপন করিলেন। দেশবাসী সাড়া দিল মহাত্মার নেতৃত্বে। স্বাধীনতার দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম সুরু হইল—অহিংসা আইন অমান্য, বিলাতী দ্রব্য বর্জন, চরকা ও খদ্দর প্রচার, বিলাসিতা ও মাদক দ্রব্য বর্জন, সরকারী খেতাব ও চাকরী প্রত্যাখ্যান, প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রাদায়িকতা পরিহার, হিন্দু মুসলমানের মিলন ও পতিত হরিজনদের সামাজিক মর্জাদা দান প্রভৃতির মাধ্যমে। দুর্বিষহ নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সহিয়া মহাত্মা ও তাঁহার সহচরগণ স্বদেশব্রত পালনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে অনেক তরুণ বিপ্লবী সায় দিয়াছিল। কিন্তু চৌরিচেরা হত্যাকাণ্ডের পর আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইলে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপ পুনরায় প্রবল হইয়া ওঠে। ব্রিটিশ সামাজ্যবাদকে অপসারিত করার চেষ্টায় সূর্য সেনের নেতৃত্বে কয়েকজন যুবক চট্টগ্রামে সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে বার বার যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু বরণ করেন ও নির্বাসন দণ্ড লাভ করেন। অসমসাহসিক বিপ্লবী সূর্যসেন চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসীর রজ্জু বরণ করিয়া স্বাধীনতার দীপশিখা অনির্বার রাখিয়া যান।

বাঙলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও তাঁহার শিষ্য সুভাষ চন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। পরে তিনি স্বতন্ত্র পথে স্বাধীনতা আন্দোলনকে পরিচালিত করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

সময় ব্রিটিশের চোখকে ফাঁকি দিয়া বীর সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে যান এবং পরে জাপানে গিয়া অন্যতম প্রবীণ ভারতীও বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সহিত মিলিত হন। প্রবাসী ভারতীয়দের সাহায্যে সৈনিকদের লইয়া তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। ভারতকে ব্রিটিশের নাগ-পাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াও আজাদ হিন্দ ফৌজ উপকরণের অভাবে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। কিন্তু বীরের রক্তস্রোত ব্যর্থ হইল না। রাত্রির তপস্যা স্বাধীনতার সূর্য্যোদয় ঘটাইল।

—মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়

॥ অনুশীলনী ॥

১। বাঙলার স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লবীদের কথা সংক্ষেপে লিখ।

২। জাতীয় মহাসমিতি কেন স্থাপিত হইল ?

৩। স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর অবদান কি ?

৪। সুভাষচন্দ্র কি ভাবে:আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন ?

৫। স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর নিজের ভাষায় একটি প্রবন্ধ লেখ।

৬। শব্দার্থ লিখ :—আত্মগ্লানি, পক্ষপাতমূলক, চণ্ডনীতি, রাজসাক্ষী, মাতৃমন্ত্রী, রজ্জু।

৭। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—ক্ষোভানল, উদ্বোধিত, স্বৈরাচারী, সত্যাগ্রহ, প্রত্যাহৃত, নির্বাসন, দণ্ডাজ্ঞা।

৮। পদান্তর কর :—দগ্ধ, অর্পণ, সংগঠক, আত্মগোপন, পতিত, প্রমাণিত, ক্ষুব্ধ।

৯। বিপরীত শব্দ লিখ :—খণ্ড, সুরু, নির্দোষ, বর্জন।

১০। কারক ও বিভক্তি লিখ।

(ক) নূতন পথের **নির্দেশ** দিলেন মহাত্মা গান্ধী। (খ) বিদ্রোহ **চারিদিকে** মাথা চাড়া দিয়া উঠিল।

শান্তিনিকেতনে বর্ষা ও শরৎ

শান্তিনিকেতনের বর্ষার অকোশে পূর্বদিগন্তে একখণ্ড মেঘোদয় হইলে পশ্চিমদিগন্ত পর্যন্ত তাহার সদা পরিবর্তনশীল জীবনলীলা অনুসরণ করা যায়। দেখিতে দেখিতে পূর্ব আকাশে মেঘের কানাতে ভরিয়া যায়। তাহার কালো ছায়ায় বাঁধের কিনারে কাজলের তুলি টানিয়া দেয়। জামবনের ডালে ঘন শ্যামল পাতার ফাঁকে কালো ফলগুলি মিলাইয়া আসে; মেঘের ছায়া প্রসারিত হইয়া পড়াতে মালতীকুঞ্জের ফুলের শুভ্রতা ঈষৎ ম্লান হইয়া যায়; তালতোড়ের পথে বাঁধের ধারে যে বেঁটে তালের ঘন সারি আছে কালো মেঘের পটের দ্বন্দ্বে তাহাদের প্রত্যেকটি পাতা প্রত্যেকটি রেখা স্পষ্টতর হইয়া উঠে।

বর্ষার প্রথম বারিপাত-মাত্রে শান্তিনিকেতনের পোড়া মাঠের সবুজ অঙ্কুর জাগে; প্রথমে নীচু জায়গায় সবুজ দেখা যায়। খোয়াইয়ের তলদেশে কচি দূর্বা গজায়, আর সেখানে লাল মখমলের-পোশাকপরা ইন্দ্রগোপ কীটের দল ব্যস্ত হইয়া উঠে।

শান্তিনিকেতনের বর্ষার ফুল মালতী ও কেয়া। দক্ষিণ ফটকের মাথা অজস্র মালতীতে ভরিয়া যায়; ছাতিমতলায় ছাতিম গাছটির

উপরে মালতীর লতা ওঠায় গাছ ছুটাকে মস্ত একটা মালতী ফুলের তোড়ার মত দেখায়। আর খোয়াইয়ের বাঁকে বাঁকে কোপাই নদীর ধারে ধারে কেয়ার ঝোপে কণ্টকিত কেয়া উঁকি মারিতে থাকে।

যেদিন ঘন বর্ষা নামে, ক্লাস বন্ধ হইয়া যায়; লোকের চলাফেরা ক্বচিৎ হইয়া উঠে। বর্ষার অবিরাম ঝর্ঝরের সঙ্গে তাল রাখিয়া অবাধ্য বাতাস শালে জামে আমে মহুয়ায় মাতামাতি করিয়া ফেরে। জল-যবনিকা দিগন্তের প্রান্ত হইতে শ্যামাছবি মুছিয়া দিতে দিতে ছুটিয়া আসে, জানালা-দরজা দুদ্দাড় করিয়া আছাড় খায়, আর জানালা-দরজার আড়াল হইতে ঘরে ঘরে নানা কণ্ঠে গান উঠিতে থাকে; তার পরে বৃষ্টি থামিয়া যায়, কিন্তু বাতাসের দাপটে গাছের পাতা হইতে জল ঝরিয়া পড়ে, বাতাস থামিয়া যায়, তখনও শাল গাছের বল্কলের রেখায় রেখায় তানপুরা বাহিয়া সুরের মত জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতে থাকে।

তারপরে কবে আবার একদিন শরতের-রৌদ্র-মাজা নির্ম্মল আকাশ দিগন্তজোড়া ডানা মেলিয়া অতিকায় স্বর্ণ-ঈগলের মত আসিয়া জলস্থল ব্যপ্ত করিয়া নিস্তব্ধভাবে বাড়িতে থাকে। আকাশ বাতাস শিশির শেফালি রৌদ্র ছায়া সবশুদ্ধ মিলিয়া যেন একটা অলৌকিক প্রসন্নতা। কাশের বনে আর ধানের ক্ষেতে সাদা ও সবুজের হিল্লোলের প্রতিযোগিতা।

শরৎকালের শান্তিনিকেতনের প্রধান পুষ্পসম্পদ শিউলি ফুলের বীথি বোঁটার ফুলের আলপনায় পরিপূর্ণ।

শরতের লঘু স্বচ্ছতার সংগে ছুটির আনন্দ চিরজড়িত। সে আনন্দ শিউলি বনে যেমন ধরা পড়ে এমন আর কোথাও নয়। সকাল বেলায় ফোটা ফুলের ছড়াছড়ির চেয়ে সন্ধ্যাবেলার কুণ্ঠিত কুঁড়ি আমার কাছে

বরাবর অধিকতর আকর্ষণের। শরতের সন্ধ্যায় মেঘ-চাপা গরম পড়ে, সেই তাপের পুটপাকে কুঁড়িগুলির অধরোষ্ঠ এতটুকু ফাঁক হয়, যাহাতে কথা বলিতে পারে না, কেবল কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে এইটুকু মাত্র বুঝিতে পারা যায়। তার উপরে পড়ে জ্যোৎস্নার ভাজে ভাঁজে শেফালির গন্ধের স্তর; আকাশে প্রান্তে জ্যোৎস্নার উৎকণ্ঠার মত টিট্টিভের কণ্ঠ আর মৌন দিগন্ত হইতে বাষ্পের নীরবতায় কী এক সংগীত যেন উঠিতে থাকে।

—প্রমথনাথ বিশী

অনুশীলনী

১। বর্ষাকাল ও শরৎকালে শান্তিনিকেতনে প্রকৃতির রূপ কেমন ভাবে বদলাইয়া যায় তাহা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর। ২। শান্তিনিকেতনের বৃক্ষলতার পরিচয় এই নিবন্ধে কি পাওয়া যায়? ৩। শান্তিনিকেতনের ঋতুপ্রকৃতির সম্পর্কে নিজে একটি প্রবন্ধ রচনা কর। ৪। সন্ধিবিচ্ছেদ কর:—মেঘোদর, দিগন্ত, নির্মল, নীরব, অধরোষ্ঠ। ৫। শব্দার্থ লিখ:—জীবনলীলা, পরিবর্তনশীল, ইন্দ্রগোপ, কণ্টকিত, অবিরাম, অতিকায়, অলৌকিক, চিরজড়িত, টিট্টিভ, পরিকীর্ণ, বীথি। ৬। বাক্যগঠন কর:—কানা, ঈষৎ, খোয়াই, কচিৎ, প্রান্ত, জলস্থল, দাপট, আলপনা, ভাঁজে ভাঁজে। ৭। নিম্নলিখিত বাক্য বা বাক্যাংশগুলি শিক্ষক মহাশয়ের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। (ক) কালো ছায়ার বাঁধের কিনারে কাজলের তুলি টানিয়া দেয়। (খ) সবশুদ্ধ মিলিয়া যেন একটা অলৌকিক প্রসন্নতা। (গ) কাশের বনে আর ধানের ক্ষেতে সাদা ও সবুজের হিল্লোলের প্রতিযোগিতা। (ঘ) মৌন দিগন্ত হইতে বাষ্পের নীরবতায় কী সংগীত যেন উঠিতে থাকে। ৮। কারক ও বিভক্তি লিখ: (ক) পূর্ব আকাশে মেঘের কানাতে ভরিয়া যায়। (খ) শরতের **সন্ধ্যায়** মেঘচাপা গরম পড়ে। (গ) ফুলের **আলপনায়** পরিকীর্ণ। (ঘ) পোড়া **মাঠে** সবুজ অঙ্কুর জাগে।

২য় অঙ্ক – প্রথম দৃশ্য

[মার্শাল সাহবের অফিস। সাহেব টেবিলে বসিয়া কাজ করিতেছেন। বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পায়ে চটি, গায়ে সাদা চাদর, সাহেব সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সংবধনা করিলেন। সাহেব বাংলা শিখিয়াছেন, শুদ্ধ কেতাবি বাংলা বলেন, ক্রিয়াপদও প্রায় সব কেতাবী, কখনও চলিত। দ স্থানে ড এবং ত স্থানে ট প্রভৃতি উচ্চারণেরও দোষ আছে]

বিদ্যাসাগর॥ আমি আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।

মার্শাল॥ কি বলুন।

বিদ্যাসাগর॥ ছুটি চাই। আমার ভাইয়ের বিয়ে, মা বাড়ী যেতে লিখেছেন।

মার্শাল॥ ছুটি? কত দিনের?

বিদ্যাসাগর॥ অন্ততঃ তিন চার দিনের।

মার্শাল॥ তাহা তো এখন অসম্ভব; কলেজের কাজকর্ম চলিবে কিরূপে?

[বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন]

বিদ্যাসাগর ॥ কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। বিয়ে ছাড়া আমার নিজেরও একটু দরকার আছে বাবা-মায়ের কাছে।

মার্শাল ॥ খুব জরুরি ?

বিদ্যাসাগর ॥ হ্যাঁ, খুব জরুরি। তাঁদের জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত আমি একটা কাজে হাত দিতে পারছি না।

মার্শাল ॥ [বিস্মিত] আপনি কি এখনও সকল কার্য তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে করেন ?

বিদ্যাসাগর ॥ সকল কার্য করি না বটে, কিন্তু এ কাজটিতে হাত দেবার আগে তাঁদের পরামর্শ নিতে চাই।

মার্শাল ॥ কি এমন কাজ ?

বিদ্যাসাগর ॥ বিধবা বিবাহ। মা বাবা যদি আপত্তি না করেন তাহলে এ নিয়ে আন্দোলন করব আমি। বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি আমি আগেই বাবার কাছে লিখে পাঠিয়েছি। তিনি এখনও উত্তর দেননি।

মার্শাল ॥ আপনার এ চেষ্টা খুবই প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু ডাক-যোগেই তো আপনি তাঁহার উত্তর পেতে পারবেন।

বিদ্যাসাগর ॥ আমি এর জন্যে ছুটি চাইছি না। আমার ভাইয়ের বিয়ে, সেইজন্যে ছুটি চাইছি।

মার্শাল ॥ আমি খুবই দুঃখিত, ছুটি দেওয়া এখন চলিবে না, কাজের বড়ই ক্ষতি হইবে।

[বাহিরে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিল। বিদ্যাসাগর উঠিলেন।]

বিদ্যাসাগর ॥ ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল। উঠি তা হলে।

মার্শাল ॥ আচ্ছা, আমি খুবই দুঃখিত, পণ্ডিত।

[বিদ্যাসাগর চলিয়া গেলেন, মার্শাল সাহেব অফিসের কাজকর্ম করিতে লাগিলেন। সহসা বিদ্যাসাগর আবার প্রবেশ করিলেন।]

বিদ্যাসাগর ॥ আমি ভেবে দেখলাম, আমাকে যেতেই হবে।

মার্শাল ॥ ছুটি না দিলেও যাবেন ?

বিদ্যাসাগর ॥ হ্যাঁ, চাকরি ছেড়ে দিয়ে যাব।

মার্শাল ॥ কি মুশকিল! তাহা হইলে তো ছুটি দিতেই হয়, [হাসিয়া] কলেজের কাজ অপেক্ষা বিবাহের নিমন্ত্রণটাই আপনার নিকট বড় হইল।

বিদ্যাসাগর ॥ নিমন্ত্রণ বড় নয়, মা ডেকেছেন সেইটাই বড়। যে সন্তান মায়ের আদেশ পালন না করতে পারে সে নরাধম।

[চলিয়া গেলেন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দামোদর তীরে একটি খেয়া ঘাট। ঘাটের নিকটে একটি কুটীর রহিয়াছে, চতুর্দিক অন্ধকার, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, প্রবল বায়ু বহিতেছে, বায়ুবেগে উত্তাল তরঙ্গ-সমাকুল দামোদরের গর্জন শোনা যাইতেছে। জনপ্রাণী কেহ নাই। দ্রুতপদে বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তাহার পর দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।]

বিদ্যাসাগর ॥ কেউ কোথাও নেই দেখছি।

[কুটীর দেখিতে পাইয়া সেইদিকে গেলেন]

মাঝি, মাঝি, এরা সব কোথা ? মাঝি!

[ঝাঁপ খুলিয়া লোক বাহির হইল।]

লোক ॥ মাঝি ফিরতে পারে নি, মেঘ দেখছেন ?

বিদ্যাসাগর ॥ তা তো দেখছি, কিন্তু আমাকে এখুনি পেরুতে হবে যে।

লোক ॥ নৌকা নৈলে যাবেন কিসে চেপে? ওপার থেকে নৌকাই তো আসে না। আর এমন ঝড়ে নৌকাই বা আসে কি করে? মেঘ দেখছেন, দামোদরের ডাক শুনছেন?

বিদ্যাসাগর ॥ সব শুনছি, কিন্তু আমাকে পেরুতেই হবে।

লোক ॥ মাঝি নৌকা নিয়ে ফিরলে তবে না পার হবেন, সে আজ আর ফিরছে না।

[বিদ্যাসাগর চাদরটি কোমরে বাঁধিলেন এবং ঘাটে নামিয়া গেলেন। লোকটি সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল]

লোক ॥ ওই পাগল বটে নাকি!

[ঝপাৎ করিয়া একটি শব্দ হইল]

তৃতীয় দৃশ্য

[বীরসিংহে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীর অভ্যন্তর। রাত্রি গভীর, চারদিক নিষুপ্ত, কপাট জানালা সব বন্ধ। একটি ঘরের বাতায়ন দিয়া ক্ষীণ একটি আলোর রেখা দেখা যাইতেছে।

(নেপথ্যে) বিদ্যাসাগর ॥ মা—মা!

(যে ঘরের জানালা দিয়া আলো দেখা যাইতেছিল, সেই ঘরের কপাট সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়া গেল। প্রদীপ হস্তে বিদ্যাসাগরের জননী ভগবতী দেবী বাহির হইয়া আসিলেন, তিনি যে জাগিয়াই ছিলেন।]

ভগবতী ॥ ঈশ্বর, এলি বাবা?

[আগাইয়া গিয়া বাহিরের কপাট খুলিতে খুলিতে]

আমি জেগেই ছিলাম, আয় বাবা, আয়। বড় রাত করলি যে? সব তোর অপেক্ষায় থেকে থেকে চলে গেল।

[কপাট খুলিয়া দিতেই বিদ্যাসাগর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার

কাপড় ভিজা, স্থানে স্থানে কাদা লাগিয়া রহিয়াছে। ভগবতী দেবী বিস্মিত হইয়া গেলেন]

একি ! [বিদ্যাসাগর প্রণাম করিলেন]

বিদ্যাসাগর ॥ (হাসিয়া) দামোদরের ঘাটে মাঝি ছিল না, সাঁতরেই চলে এলাম।

ভগবতী ॥ পাগল ছেলের কাণ্ড দেখ দেখি। আয়, কাপড় ছাড়; মাথাটা মোছ আগে। —ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

অনুশীলনী

১। এই নাট্যাংশে বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির কী পরিচয় পাওয়া যায় ?

২। বিদ্যাসাগর ও মার্শাল সাহেবের কথোপকথনের মধ্যে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের কোন্ কোন্ দিক প্রকাশ পাইয়াছে ?

৩। শব্দার্থ লিখ :—

সসম্ভ্রমে, কেতাবী, জরুরি, ঘনঘটাচ্ছন্ন, তরঙ্গ-সমাকুল, বাতায়ন।

৪। বাক্য গঠন কর :—

কাজকর্ম, অনুমতি, নিমন্ত্রণ, প্রশংসাযোগ্য, আন্দোলন, ডাকযোগে।

৫। পদান্তর কর :—

পণ্ডিত, পাগল, শাস্ত্রীয়, দুঃখিত, ঝড়।

প্রমাণাদি, নরাধম, মহাশয়, ঘটাচ্ছন্ন।

৬। কারক বিভক্তি লিখ :—

(ক) **মেঘ** দেখছেন ?

(খ) দামোদরের **ঘাটে** মাঝি ছিল না।

(গ) সে **আজ** আর ফিরছে না।

(ঘ) একটা **কাজে** হাত দিতে পারছি না।

———
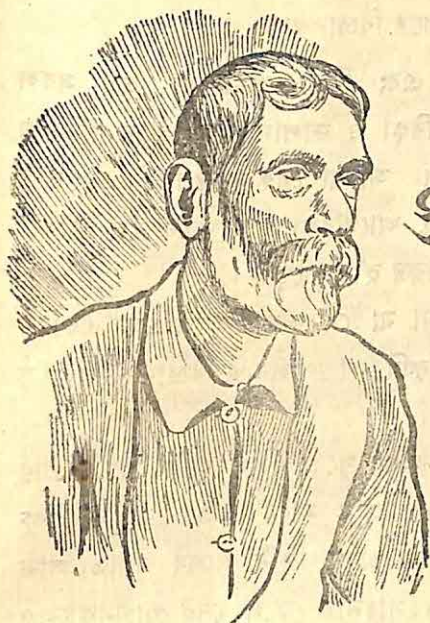
প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা

রসায়ন-বিজ্ঞান কি, তা' হয়তো তোমরা অনেকেই জানো না। আমরা যা-কিছু পদার্থ পাই এবং ব্যবহার করি, তাহার উপদান কি, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করা এবং কোন্ কোন্ উপাদানের সংযোগে কি উপায়ে মানুষের প্রয়োজনীয় নানা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সৃষ্টি করা যেতে পারে, তার প্রণালী উদ্ভাবন করাই রসায়ন-বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য।

স্নানের সময় তোমরা যে সুগন্ধ তেল মাথায় দাও, যে সুন্দর সাবান গায়ে মাখো, যে সুবাসিত পাউডার ব্যবহার কর, যে সুরভি স্নিগ্ধ ক্রিম মুখে দাও, সে সমস্তই আজ রসায়ন-বিজ্ঞান-শিক্ষার ফলে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। অসুখের সময় তোমরা যে সমস্ত ঔষধ সেবন ক'রে রোগমুক্ত হও, তাও রসায়ন-বিজ্ঞানের সাহায্যেই প্রস্তুত।

মানুষের অতি-প্রয়োজনীয় এবং নিত্য ব্যবহারের এই সকল অসংখ্য জিনিস ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান থেকে প্রচুর পরিমাণে আমাদের দেশে আমদানি হয়। আমরা সেই সমস্ত কিনি এবং তার ফলে আমাদের পয়সা ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে চলে যাচ্ছে। তারা ধনী হ'য়ে উঠছে, আমরা দরিদ্র হ'য়ে পড়েছি।

কিন্তু তোমরা হয়তো জানো না যে অতীতকালে এমন একদিন ছিল, যখন ভারতবর্ষ জগতে কৃষি, পশুপালন ও বিজ্ঞান-চর্চায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার কর্‌তে পেরেছিল।

যীশুখৃষ্ট জন্মাবার তিনশত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দু-হাজার দু'শো বৎসর পূর্বে নাগার্জুন নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। প্রাচীন ভারতে রসায়ন চর্চায় তিনি অশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর একাগ্র চেষ্টা ও সাধনার ফলে সেই প্রাচীনকালেও বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছিল।

মধ্য-প্রদেশের রাজধানী নাগপুর শহরের নিকট একটি নিভৃত নির্জন পাহাড়ের উপর নাগার্জুনের রসায়নাগার বা বিজ্ঞান অনুশীলন-মন্দির এখনো দেখতে পাওয়া যায়।

চরক ও সুশ্রুত নামে দু'খানি প্রসিদ্ধ প্রাচীন আয়ুর্বেবদশাস্ত্র আছে। ঐ দু'খানি পুস্তকে অনেক রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত প্রণালীর বিবরণ আছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এই দু'খানি অমূল্য গ্রন্থ খৃষ্ট-জন্মের বহুপূর্বে রচিত।

প্রাচীন ভারতের এই দু'খানি গ্রন্থে এমন চমৎকার রাসায়নিক প্রণালী ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত-বিধির বর্ণনা আছে, যা' যীশু-খৃষ্টের জন্মাবার প্রায় সতেরো-শো বছর পরে ইউরোপে যে-সব বিজ্ঞানের বই রচিত হয়েছিল, কেবলমাত্র তাতেই দেখতে পাওয়া যায়

খনিজ ধাতুর ব্যাপারে প্রাচীন ভারতের রসায়ন-বিজ্ঞান যে কতদূর উন্নতি লাভ করেছিল, তার উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায় দিল্লীর একটি পুরাতন লৌহস্তম্ভে। এই লৌহস্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল প্রায় দেড়-হাজার বছর পূর্বে। জলবায়ুর সংস্পর্শে লোহার জিনিস অল্পদিনেই মর্‌চে ধরে। কিন্তু দেড়-হাজার বছর পূর্বে তৈরি এই লোহার থাম্‌টিতে আজও পর্যন্ত বিশেষ মর্‌চে ধর্‌তে পারেনি। এ অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার। এই লৌহস্তম্ভটি প্রায় ষাট ফুট উঁচু অর্থাৎ উচ্চে প্রায় পাঁচতলা বাড়ির সমান। এতবড় একটি লোহার থাম বর্তমান জগতের কোনও সর্বশ্রেষ্ঠ বৃহৎ লোহার কারখানাতেও প্রস্তুত করা সহজ নয়। এ থেকে প্রমাণ হয়, প্রাচীন ভারতের ধাতুবিদেরা ধাতু-রসায়নে বিশেষ পারদর্শী ও অভিজ্ঞ ছিলেন। সম্প্রতি ইউরোপ ও আমেরিকার ধাতু-বৈজ্ঞানিকেরা মর্‌চে-বিরোধি (Rust Proof) ইস্পাত প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কার করেছেন বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারত দেড়-হাজার বৎসর পূর্বে এই জিনিসটি তৈরী কর্‌তে জান্‌তেন।

প্রাচীন ভারতের এই উন্নত বিজ্ঞান-সাধনা পরবর্তী যুগে ক্রমশঃ লোপ পায়। বহুকাল ভারতবাসীরা আর বিজ্ঞান-চর্চা করেনি। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপ ও আমেরিকা একাগ্র সাধনায় বিজ্ঞানের অনুশীলন ক'রে যে রকম দ্রুত আশ্চর্য উন্নতিলাভ করেছে তা' যথার্থ ই প্রশংসনীয় ও আমাদের অনুকরণীয়। এই বিজ্ঞান-চর্চার ফলে তারা আজ টেলিগ্রাম, টেলিফোন, বেতারবার্তা, উড়োজাহাজ, সবাক্‌চিত্র, টেলিভিশন, প্রভৃতি বিবিধ বিস্ময়কর ও অদ্ভুত আবিষ্কার করেছে। আলাদীনের "আশ্চর্য্য প্রদীপে"র মত বিজ্ঞান আজ দেশের মানুষকে প্রভূত শক্তিসম্পদের অধিকারী ক'রে তুলেছে। বিজ্ঞান-সাধনার ফলে ইউরোপ ও আমেরিকা আজ পৃথিবী জয় করেছে।

তাই বলি, বাংলার ছেলে-মেয়েরা, তোমরাও মনে রেখো—এই পৃথিবীতে মানুষের মত বাঁচ্‌তে হ'লে আমাদেরও বিজ্ঞান-সাধনায় একাগ্র মনে ব্রতী হ'তে হবে।

সুখের বিষয়, কিছুদিন থেকে ভারতবর্ষেও বিজ্ঞান-চর্চার দিকে লোকের মন আকৃষ্ট হয়েছে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কেউ কেউ জগতের বৈজ্ঞানিক সমাজে সমাদর ও সম্মান লাভ করেছেন, এ যে একটি মস্ত শুভ লক্ষণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐটুকুই যথেষ্ট ব'লে মনে ক'রে ব'সে থাক্‌লে চলবে না! যতদিন না এদেশের জনসাধারণের মধ্যে উচ্চবিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন হচ্ছে, ততদিন আমাদের দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র্য ও পরাপেক্ষিতা ঘুচবে না। বাংলার ছেলে-মেয়েরা তোমরাই এদেশের ভবিষ্যৎ আশাভরসা ; আশা করি, তেমরা উত্তর-জীবনে এই মহাকার্যে ব্রতী হবে। (সংক্ষিপ্ত)

—আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

অনুশীলনী

১। প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান-চর্চার বিষয় কি জান ?

২। বিজ্ঞান-চর্চার ফলে বিদেশের কি কি লাভ হইয়াছে ?

৩। ভারতবর্ষের বিজ্ঞান-চর্চায় মনোনিবেশ করা উচিত কেন ?

৪। শব্দার্থ বল :—উদ্ভাবন, সুরভি, প্রক্রিয়া, ধাতুবিদ, পরাপেক্ষিতা, উত্তরজীবন।

৫। 'মরচে ধরা' কথাটার অর্থ কি ? মাথাধরা, চোরধরা প্রভৃতি কথায় 'ধরা' ক্রিয়ার অর্থ-পার্থক্য লক্ষ্য কর ও প্রত্যেকটি ক্রিয়া দ্বারা এক একটি বাক্য রচনা কর।

৬। ব্যাখ্যা কর : 'আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের' মত······অধিকারী ক'রে তুলেছে।

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা ৩ ৩০

—মৌখিক প্রশ্ন—

॥ দার্জিলিং যাত্রা ॥

১। রামশঙ্কর কাকা দেখতে কি রকম ? দামুকদিয়া ষ্টেশনে নেমে দার্জিলিং যাত্রীদের কি করতে হয় ? ৩। কলের ট্রামগাড়ী বলতে লেখক কি বুঝেছেন ? ৪। গয়াবাড়ী ষ্টেশনে গেলে কী দেখা যায় ?

॥ কুসংস্কার ॥

১। "দুপাতা ইংরেজী পড়ে শাস্ত্র বিশ্বাস না করলে চলবে কেন বাবু"—বাক্যটি কে কাকে বলেছিল ? ২। 'কুসংস্কার' গল্পটিতে কোন্ গ্রামের ঘটনা বলা হয়েছে ? বৃন্দাবন পুকুরে কাপড় ধুতে নিষেধ করেছিল কেন ? ৪। "আমি শাস্ত্র বিশ্বাস করি, মনগড়া শাস্ত্র মানিনে"—এই বাক্য কে কখন বলেছিল ?

॥ রাখীবন্ধন ॥

১। হাভেন সাহেব, বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন—এঁরা সব কে ? পরিচয় দাও। ২। "একদিনের সব রোজগার স্বদেশের কাজে দিলে"—কাদের প্রসঙ্গে এই কথা বলা হয়েছে ?

॥ বনভোজন ॥

১। বনভোজন কারা কোথায় করেছিল ? ২। "কি কি তরকারী দুগ্‌গা দিদি ?"—কে বলেছিল ? তার পরিচয় কি ? ৩। "আবার ও বেলা ভাত খাবি ?"—কে কখন কাকে বলেছিল ?

॥ এভারেষ্ট বিজয় ॥

১। এভারেষ্ট অভিযাত্রীদের মধ্যে প্রধান কে কে ছিলেন ? ২। কোন্‌খান থেকে অভিযান সুরু হয়। ৩। 'থায়াংবক' জায়গাটায় অভিযাত্রীরা কি করল ? ৪। চূড়ায় পৌঁছে তেনজিং কি করলেন ?

॥ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ॥

১। "উদ্ভিদদেহেও জগদীশচন্দ্র এইরূপ সাড়ার অনুসন্ধান করিলেন।"—কোন্ 'সাড়া' সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে ? ২। লজ্জাবতী লতা কি ভাবে

সাড়া দেয়? অন্য গাছ তেমন ভাবে দেয় না কেন? ৩। ক্লোরোফর্ম দিলে গাছের কি হয়? [তোমার পঠিতব্য রচনায় যা আছে তাই বল]

॥ দেশবন্ধু ॥

১। দেশবন্ধুর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র কতদিন ছিলেন? ২। দেশবন্ধুর মধ্যে কোন্ গুণ সুভাষচন্দ্র লক্ষ্য করেছেন?

॥ শিল্পনগরীর জন্মকথা ॥

১। নোতুন শিল্পনগরী কোথায় গড়ে উঠেছে? ২। পরিপূরক বন্দর স্থাপনের উদ্দেশ্য কি? ৩। দেশে একাধিক তৈল শোধনাগার তৈরি করার প্রয়োজন কি?

॥ বুদ্ধদেব ॥

১। বোধি কাকে বলে? ২। বুদ্ধদেব কোথায় দেহত্যাগ করেন? ৩। বৌদ্ধধর্ম্ম দেশের বাইরে কোথায় প্রসার লাভ করে?

॥ ভারতের কৃষি ॥

১। কালো মাটিতে কিসের চাষ হয়? ২। পলিমাটি কোথায় দেখা যায়? ৩। পাটকিলে মাটি কোথায় দেখা যায়? ৪। ভূমিক্ষয় কি জন্যে হয়?

॥ স্বাধীনতার সাধনা ॥

১। প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম সম্বন্ধে কি জান? ২। অরবিন্দ কি ভাবে মুক্তি পান? ৩। বাঘা যতীন কে? তাঁর সম্বন্ধে কি জান? ৪। কিসের মাধ্যমে গান্ধীজীর আন্দোলন সুরু হয়।

॥ শান্তিনিকেতনে বর্ষা ও শরৎ ॥

১। শান্তিনিকেতনে বর্ষার সময় কোন্ কোন্ ফুল ফোটে? ২। শরৎকালে শান্তিনিকেতনে আকাশের রূপ কি রকম হয়?

॥ প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান-চর্চা ॥

১। নাগার্জুন কে? ২। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের কি কি গ্রন্থ আছে? ৩। দিল্লীর লৌহস্তম্ভে ভারতের রসায়ন-বিজ্ঞানের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

বাংলা ভাষা

[বাংলা গানের কবি অতুলপ্রসাদ। বঙ্গভঙ্গের সময় তিনি দেশাত্মবোধের গান রচনা করিয়াছিলেন। এই গানটিতে বাংলা ভাষার প্রতি কবির প্রীতির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে]

মোদের গরব, মোদের আশা আ মরি, বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা!
কি জাদু বাংলা গানে!
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে!
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।
এই ভাষাতেই নিতাই গোরা
আনল দেশে ভক্তিধারা,
আছে কৈ এমন ভাষা এমন দুঃখশ্রান্তিনাশা।
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন,
হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন,
এই ফুলেরই মধুর রসে বাঁধল সুখে মধুর বাসা।
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আনল মালা জগৎ জিনে,
তোমার চরণতীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া-আসা।
এই ভাষাতেই প্রথম বোলে,
ডাক্‌নু মায়ে 'মা' 'মা' বলে,
এই ভাষাতেই বলব 'হরি' সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা!

—অতুলপ্রসাদ সেন

অনুশীলনী

১। কবিতাটি বারবার পড় ও মনে রাখ।

২। বাংলা ভাষা কবির নিকট কিজন্য এত প্রিয় বুঝাইয়া দাও।

৩। বাংলা ভাষার কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিকের নাম বল।

৪। সরলার্থ লিখ :—

(ক) বাজিয়ে রবি......করে যাওয়া-আসা।

(খ) এই ভাষাতেই......সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা।

৫। শব্দের অর্থ লিখ :—

বাউল, বোলে, ভক্তিধারা, দুঃখশ্রান্তিনাশা, জিনে, চরণতীর্থে।

৬। কারকবিভক্তি নির্ণয় কর :—

(ক) আনল দেশে **ভক্তিধারা**। (খ) ডাকনু মায়ে 'মা' 'মা' বলে। (গ) বাঁধল **সুখে** মধুর বাসা। (ঘ) ধান কাটে **চাষা**।

৭। বাক্যরচনা কর :—

সাঙ্গ, জাদু, মধুর, যাওয়া-আসা, কাঁদা-হাসা।

৮। মুখে মুখে বল :—

(ক) নিতাই, গোরা কে? (খ) বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন—কিসের জন্যে খ্যাত? (গ) অন্য পদ বল :—ভক্তি, দুঃখ, মধুর, নাশা।

এই কবিতায় বাংলা ভাষার প্রতি কবির গভীর মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে।

পাটনীর বরলাভ

[নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়। বাংলা কাব্যের পুরাতন যুগের তিনি শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যে অন্নদা-মঙ্গল কাব্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।]

সভয়ে পাটনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল॥
হের দেখ সেঁউতিতে থুয়েছিলা পদ।
কাঠের সেঁউতি মোর হৈল অষ্টাপদ॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয়॥
তপজপ নাহি জানি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার॥
যে দয়া করিলা মোরে এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হইতে মোরে দেহ পরিচয়॥
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্যকথা বুঝহ ভাবিয়া॥
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশিতে।
চৈত্রমাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে॥
ভবানন্দ মজুমদার নিবাসে রহিব।
বর মাগো মনোনীত যাহা চাবে দিব॥

Library
Calcutta

প্রণমিয়া পাটনী কহিছে জোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধেভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥

—**ভারতচন্দ্র রায়**

অনুশীলনী

১। পাটনী কি দেখিয়া দেবীর আসল পরিচয় জানিতে চাহিয়াছিল ?

২। দেবীর নিকট পাটনী কি বর চাহিয়াছিল ? এই চাওয়ার মধ্যে তাহাকে কিরূপ লোক মনে হয় ?

৩। "আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে" উক্তিটির ভাব ব্যাখ্যা করিয়া লিখ।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখ :—
সেঁউতি, অষ্টাপদ, মনোনীত, থুয়েছিলা, নিবাস, উদর, নারি, চাবে।

৫। নিম্নলিখিত পদগুলি দিয়া বাক্য রচনা কর :—
সভয়ে, ছল, পরিচয়, প্রকাশ, পদ।

৬। কারক ও বিভক্তি লিখ :—
(ক) থুয়েছিলা **পদ**। (খ) **চৈত্রমাসে** মোর পূজা।
(গ) দয়ায় দিয়াছ দেখা।

৭। মুখে মুখে উত্তর দাও :—
(ক) ভবানন্দ মজুমদার কে ?
(খ) অন্য পদ বল :—ধ্যান, জ্ঞান, ছল, দয়া।
(গ) অন্নপূর্ণা কে ? "প্রকাশ কাশিতে"—কথার অর্থ কি ?

আনারস

[ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পুরাতন যুগের শেষ খাঁটি বাঙালী কবি। অপর দিকে নবীন লেখকদের গুরু। 'সংবাদ প্রভাকর' নামে বিখ্যাত পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। বঙ্কিম-দীনবন্ধুর মতো নব্য কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্য রচনার হাতেখড়ি হয় এই পত্রিকায়। সমকালের সমাজচিত্র এই কবির লেখায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপে উজ্জ্বল।]

লোকে বলে আনা রস, আনারস নয়।
আনা রস হলে কেন জানা রস হয়?
তারে তার জানা যায় রস ষোল আনা,
অরসিক লোক তবু বলে তারে আনা॥
ফেলিয়া পনর আনা, এক আনা রাখে
এই.হেতু 'আনারস' বলে লোকে তাকে॥
অরসিক নাহি করে, রসেতে প্রবেশ।
আনাতেই ষোল আনা, না জানি বিশেষ॥
কোথা বা আনার রস, এ আনার কাছে?
ক্ষুদ্র দামে খেতে পাই, এতটুকু গাছে॥
বেদানা তাহার নাম দানা যাতে ভরা।
কেমনে হইবে সেই সর্বমনোহরা?
রস যত যশ তত বেদনায় আছে?
আমাদের কাছে নয় ধনীদের কাছে॥
এক আধ সের খায় আছে যার ধন।
কুবেরের হলে মন, নাহি পায় মণ॥

প্রয়োজন নাহি তার এখানেতে এসে।
মঙ্গল করুন তিনি, মঙ্গলের দেশে ॥
আমাদের আনারস, ষোল আনা সুখ।
দরিদ্রের প্রতি তিনি না হন বিমুখ ॥

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

অনুশীলনী

১। কবি আনারসের এত গুণগান করিয়াছেন কেন?

২। ব্যাখ্যা লিখ—

(ক) কোথা বা আনার রস…গাছে।

(খ) এক আধ সের……নাহি পায় মণ।

৩। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলির ভাব বিশদভাবে লিখ :—

(ক) মঙ্গল করুন তিনি মঙ্গলের দেশে।

(খ) তারে তার জানা যায় রস ষোল আনা।

(গ) কুবেরের হলে মন, নাহি পায় মণ।

৪। বাক্য রচনা কর :—

অরসিক, দানা, সর্বমনোহরা, বিমুখ।

৫। 'আনা'—কথাটি কবি কি কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন?

৬। মুখে মুখে উত্তর দাও :—

(ক) পদ বল—রস, যশ, সুখ, বিমুখ, ক্ষুদ্র।

(খ) মঙ্গলের দেশ বলতে কোন্ স্থানকে বুঝায়?

(গ) কুবের কে?

———

রামের বিলাপ

[আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ মাইকেল মধুসূদন দত্ত। হিন্দু কলেজে পড়িবার সময় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। মাদ্রাজে শিক্ষকতা করিবার সময় ইংরাজীতে কাব্য রচনা করেন। বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে মেঘনাদ বধ, ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা—তিনখানি কাব্য রচনা করিয়া অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দেন। শেষ জীবনে ফ্রান্সে অবস্থান কালে লেখেন "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"। কবির শেষ জীবন বড় দুঃখময়]

"উঠ, বৎস! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্য ভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে!
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি চাহ তুমি মোর পানে,
প্রাণাধিক? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার! আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি
পূজিনু দেবতাকুলে, দিলা কি দেবতা
এই ফল? হে রজনী, দয়াময়ী তুমি;
শিশির-আসরে নিত্য সরস' কুসুমে,
নিদাঘার্ত; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে!

স্বধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু ; বিতর'
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।"

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

অনুশীলনী

১। কবিতাটি ভাল করিয়া (ছন্দ বুঝিয়া শিক্ষকমহাশয়ের সাহায্যে) পাঠ কর।

২। রাম লক্ষ্মণের জন্য কী বলিয়া বিলাপ করিয়াছেন ?

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির গদ্যরূপ লিখ :—পশিলা, তিতি, পূজিনু, হেরিলে, বিতর।

৪। নিম্নলিখিত শব্দের অর্থ লিখ :—বিমুখ, আচার, প্রসূন, স্থধানিধি, সুভ্রাতৃবৎসল, আসরে।

৫। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :— করুণাময়, চিরানন্দ, সুধাংশু, নিদাঘার্ত।

৬। মুখে মুখে উত্তর দাও :—

(ক) রাঘব কাহার নাম ? তিনি ভিখারী কিজন্য ?

(খ) 'সুধানিধি'— কাকে বলা হচ্ছে ?

(গ) ভোগ, বিমুখ, করুণাময়, দেবতা—এইগুলি কি পদ ? অন্য পদে কি হবে ?

———

প্রার্থনা

[বাংলা কাব্যের ইতিহাসে মহিলা কবি হিসাবে কামিনী রায়ের একটি বিশেষ স্থান আছে। তাঁহার কাব্যগুলির নাম—আলো ও ছায়া, নির্ম্মাল্য, ধূপ ও দীপ।]

ওহে দেব! ভেঙ্গে দাও ভীতির শৃঙ্খল,
ছিঁড়ে দাও লাজের বন্ধন,
সমুদয় আপনারে দিই একেবারে
জগতের পায়ে বিসর্জন
স্বামিন্ নিদেশ তব হৃদয়ে ধরিয়া
তোমারি নির্দ্দিষ্ট করি কাজ,—
ছোট হোক, বড় হোক, পরের নয়নে
পড়ুক্ বা না পড়ুক্ তাহে কোন লাজ ?
তুমি জীবনের প্রভু, তব ভৃত্য হয়ে
বিলাইব বিভব তোমার ;
আমার কি লাজ, আমি ততটুকু দিব,
তুমি দেছ যে টুকুর ভার।
ভুলে যাই আপনারে, যশ অপবাদ
কভু যেন স্মরণে না আসে,
প্রেমের আলোক দাও, নির্ভয়ের বল,
তোমাতেই তৃপ্ত কর দাসে।

– কামিনী রায়

অনুশীলনী

১। কবিতাটির ভাববস্তু নিজের ভাষায় লিখ।

২। কবি ভগবানের নিকট কী চাহিয়াছেন? কী ভাবে তিনি জগতের কাজ করিতে চান?

৩। নিম্নলিখিত শব্দের দ্বারা বাক্য রচনা কর:—শৃঙ্খলা, বন্ধন, বিসর্জন, বিভব, তৃপ্ত।

৪। কারকবিভক্তি নির্ণয় কর:—(ক) ছিঁড়ে দাও **লাজের বন্ধন**। (খ) তোমারি নির্দিষ্ট করি **কাজ**। (গ) কভু যেন **স্মরণে** না আসে। (ঘ) প্রেমের **আলোক** দাও।

মাতৃভূমি

[ভাওয়ালের বিখ্যাত কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস সত্যকার স্বভাব কবি। দারিদ্র্য-দুঃখ, শোকতাপ ও উৎপীড়ন তাঁহার কাব্য সাধনাকে ব্যাহত করিয়াছিল। তাঁহার কাব্যগুলির নাম—কুঙ্কুম, কস্তুরী, বৈজয়ন্তী।]

জননী গো জন্মভূমি তোমারি পবন
দিতেছে জীবন মোরে নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
সুন্দর শশাঙ্ক মুখ উজ্জ্বল তপন
হেরেছি প্রথমে আমি তোমারি আকাশে।
ত্যজিয়া মায়ের কোল তোমারি কোলেতে
শিখিয়াছি ধুলিখেলা তোমারি ধুলিতে।
তোমারি শ্যামল ক্ষেত্র অন্ন করি দান
শৈশবের দেহ মোর করেছে বর্ধিত।
তোমারি তড়াগ মোর রাখিয়াছে প্রাণ
দিয়ে বারি জননীর স্তন্যের সহিত।
তোমারি মাটিতে মাগো প্রথম চরণ
বাড়ানু মায়ের কর করিয়া ধারণ।
তোমারি তরুর তলে কুড়ায়েছি ফল,
তোমারি লতার ফুলে গাঁথিয়াছি মালা;
সঙ্গীদের সঙ্গে সুখে করি কোলাহল
তোমারি প্রান্তরে আমি করিয়াছি খেলা।
তোমারি মাটিতে ধরি জনকের কর
শিখেছি লিখিতে আমি প্রথম অক্ষর।

ত্যজিয়া তোমার কোল যৌবনে এখন
হেরিলাম কতদেশ কত সৌধমালা।
কিন্তু তৃপ্ত না হইল এ দু'টি নয়ন
ফিরিয়া দেখিতে চাহে তব পর্ণশালা।

—গোবিন্দচন্দ্র দাস

॥ **অনুশীলনী** ॥

১। মাতৃভূমির প্রতি গভীর প্রীতি কবি যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন. তোমার ভাষায় লিখ।

২। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলির অন্তর্নিহিত ভাব বুঝাইয়া দাও :—
(ক) তোমারি শ্যামল……স্তন্যের সহিত। (খ) ত্যজিয়া তোমার…… তব পর্ণশালা।

৩। শব্দের অর্থ লিখ :—
তপন, পবন, শশাঙ্ক, শ্যামল, শৈশব, তড়াগ, কোলাহল, সৌধ, পর্ণশালা।

৪। পদ পরিবর্তন কর :—
তৃপ্ত, সুখ, সুন্দর, শৈশব, শ্যামল, উজ্জ্বল।

৫। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :—
(ক) তোমারি তরুর তলে কুড়ায়েছি **ফল**।
(খ) তোমারি লতার **ফুলে** গাঁথিয়াছি মালা।
(গ) তোমারি শ্যামল ক্ষেত্র **অন্ন** করি দান।
(ঘ) তোমারি **প্রান্তরে** আমি করিয়াছি খেলা।

৬। মুখে মুখে উত্তর দাও :—
(ক) "মায়ের কর" ধরিয়া কবি কি শিখিয়াছেন ?
(খ) "জনকের কর" ধরিয়া কবি কি করিয়াছেন ?
(গ) সুন্দর, উজ্জ্বল, শ্যামল, শৈশব, যৌবন—এইগুলি কোন পদ ? অন্য পদে বল।

দেবতার বিদায়

[বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও ভারতের মহাকবিগণের অন্যতম কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন কর্মময়। তিনি বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃতি-মানব-ঈশ্বরের লীলাভূমি যেন তাঁহার অজস্র কাব্য। বিশ্বজনীন ভাবে উহারা পরিপূর্ণ—তাই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শের মিলনস্থল।]

দেবতামন্দির-মাঝে ভকত প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধুলিমাখা দেহে,
বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে।
কহিল কাতর কণ্ঠে, 'গৃহ মোর নাই,
এক পাশে দয়া করে দেহো মোরে ঠাঁই'।
সসংকোচে ভক্তবর কহিলেন তারে,
'আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যারে'।
সে কহিল 'চলিলাম'—চক্ষের নিমেষে
ভিখারী ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, 'প্রভু, মোরে কি ছল ছলিলে'।
দেবতা কহিল, 'মোরে, দূর করি দিলে।—
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে'।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুশীলনী

১। কবিতাটির মূল ভাব নিজের ভাষায় লিখ।

২। শব্দের অর্থ লিখ :—

প্রবীণ, নিশিদিন, জীর্ণ, কাতর, অপবিত্র, নিমেষে, সসংকোচে।

৩। গদ্যরূপ লিখ :—ভকত, পশিল, ছলিলে, ফিরি।

৪। কারকবিভক্তি নির্ণয় কর :—(ক) দয়া করে দেহ মোরে **ঠাঁই**, (খ) জপিতেছে জপমালা বসি **নিশি দিন**, (গ) পশিল সে **গেহে**, (ঘ) **গৃহহীনে** গৃহ দিলে (ঙ) হেনকালে **সন্ধ্যাবেলা** ধুলিমাখা দেহে বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে।

৫। বাক্য রচনা কর—জপমালা, সসংকোচে, ধুলিমাখা, চক্ষের নিমেষে।

৬। মুখে মুখে উত্তর দাও—

(ক) গৃহ মোর নাই—কে বলিয়াছিল?

(খ) সে কহিল চলিলাম—'সে' বলিতে কাকে বোঝায়?

(গ) 'দেবতার বিদায়'—কথাটিতে কি বুঝায়?

(ঘ) প্রবীণ, জীর্ণ, পশিল. ছল, দীন—এইগুলি কী পদ?

(ঙ(কী করিলে দেবতা ঘরে থাকেন?

(চ) এই কবিতার অন্য একটি নাম তুমি নিজে দাও।

আত্মত্রাণ

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে নাহি-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়!
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে—
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা—
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সান্ত্বনা
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্রশিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে—
দুখের রাতে নিখিল ধরা যে দিন করে বঞ্চনা,
তোমারে যেন না করি সংশয়।

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুশীলনী

১। কবি ভগবানের নিকট কী প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা নিজের ভাষায় লিখ।

২। সরলার্থ লিখ ঃ-

(ক) সহায় মোর····· না যেন মানি ক্ষয়।

(খ) নম্রশিরে·······না করি সংশয়।

৩। শব্দার্থ লিখ :—দুঃখতাপে, ত্রাণ, নিখিল, সংশয়।

৪। সাধুগদ্যে প্রকাশ কর :— চিতে, জুটে, টুটে, শকতি, লভিলে তরিতে।

৫। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ—

(ক) ব্যথিত **চিতে** নাহি-বা দিলে সান্ত্বনা।

(খ) **দুঃখে** যেন করিতে পারি জয়।

(গ) লভিলে শুধু **বঞ্চনা**।

(ঘ) **এ** নহে মোর প্রার্থনা।

৬। মুখে মুখে উত্তর দাও—

(ক) কবিতাটি মুখস্থ বল।

(খ) 'আত্মত্রাণ' কথাটির মানে কি ?

(গ) কবিতার আর কি নাম দেওয়া যায় ?

(ঘ) ব্যথিত, ক্ষয়, বঞ্চনা নম্র—এইগুলি কি পদ ?

———

জাতির পাঁতি

[রবীন্দ্রনাথের ভক্ত অনুরাগী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। বাংলা ভাষা ও ছন্দের প্রতি তাঁহার সমধিক টান। জ্ঞান, ভাবুকতা ও পাণ্ডিত্যের সমন্বয়ে তাঁহার কবিতাগুলির ভাব স্বতন্ত্র। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য – তীর্থ সলিল, কুহু ও কেকা, অভ্র ও আবীর]

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি ;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।
শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচা গুলি ডাঁটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,
জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙ্গা
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারি সমান রাঙা।
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র
কৃত্রিম ভেদ ধুলায় লোটে।

রাগে-অনুরাগে নিদ্রিত জাগে
আসল মানুষ প্রকট হয়,
বর্ণে বর্ণে নাহিরে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

অনুশীলনী

১। কবিতাটির মূল ভাব নিজের ভাষায় লিখ।

২। 'বর্ণে বর্ণে নাহিরে বিশেষ•নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়'—উক্তিটির অন্তর্নিহিত ভাব বিশদভাবে প্রকাশ কর।

৩। সরলার্থ লিখ—

(ক) কালো আর ধলো……ভিতরে সবারি সমান রাঙা।

(খ) বাহিরের ছোপ……পলকে ফোটে।

৪। শব্দার্থ লিখ—পাঁতি, পালিশ, যুঝি, ছোপ, কৃত্রিম, প্রকট, ডাটো, বিশেষ, অনুরাগে, লোটে।

৫। মুখে মুখে উত্তর দাও :—

(ক) "জাতির পাঁতি"—কথাটির অর্থ বল।

(খ) আসল মানুষ কিসে প্রকট হয়?

(গ) মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য কোথায়?

(ঘ) মানুষের মধ্যে কোথায় মিল আছে?

(ঙ) সাথী, ক্ষুধা, কচি, কাঁচা, ভেদ—এইগুলি কি পদ?

[রবীন্দ্রকবি-গোষ্ঠীর মধ্যে অগ্রজ করুণানিধান। নদীয়া জেলার শান্তিপুর শহর তাঁহার জন্মস্থান। বাংলা গীতিকবিতায় নোতুন ধরণের প্রকৃতি প্রীতির উপস্থাপনা ও ছন্দ এবং ভাব অনুযায়ী শব্দ রচনা কবির মৌলিক প্রতিভার নিদর্শন। কবির রচিত কাব্যগুলির নাম—প্রসাদী, ঝরাফুল, শান্তিজল, ধানদূর্ব্বা।

ছুটব আমি সরল প্রাণে পর্ণকুটীর হ'তে,
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায় ছুটব আলিপথে!
বনের মাথায় আঁধার ফুড়ে' শুকতারাটি জাগবে দূরে
কান জুড়াবে পাখীর গানে সুরের মিঠে স্রোতে।
বুক ফুলায়ে হাল ধরিব পাল তুলিব না'য়ে,
মাঝগঙ্গায় জাল ফেলিব উদাস আদুল গায়ে
গাঙচিলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়বে ভাঙা পাড়ের বাঁকে
ডাকবে চাতক 'ফটিক জল' মেঘের ছায়ে ছায়ে।
অবাক হ'য়ে দাওয়ায় বসে দেখব দুপুর বেলা,
পরিষ্কার ওই আকাশ-আলোয় পাখীর সাঁতার-খেলা;
কাঠ-ঠোক্‌রা ঠোঁটের ঘায়ে গাছের হেলা গুঁড়ির গায়ে
সুড়ঙ্গটি করছে গভীর—পাখায় রঙের মেলা।
কামার-শালে বস্‌ব গিয়ে, রৌদ্র এলে পড়ি,
কয়লাগুলো রাঙিয়ে দিয়ে টানব যাঁতার দড়ি;
ঝুলের কাছে জমবে ধোঁয়া কাঁপিয়ে 'নেহাই' পিটব লোহা
ছিটিয়ে দেব আগুন-যুঁই—আলোর ছড়াছড়ি!

শুনতে যাব ভারতকথা রামায়ণের গান,
সীতার দুঃখে চোখের জলে গলবে মনঃপ্রাণ ;
বনবাসের করুণ কথা শুনতে বুকে বাজবে ব্যথা
ফিরবে ঘরে দুঃখভরে ক্ষুব্ধ ম্রিয়মাণ।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুশীলনী

১। কবির মনের কী কী বাসনা এই কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে ?

২। পল্লীজীবনকে কবি কী ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা বর্ণনা কর।

৩। সরলার্থ লিখ : ক) ঝুলের কাছে……আলোর ছড়াছড়ি।
(খ) বনবাসের করুণ…… …ক্ষুব্ধ ম্রিয়মান।

৪। বাক্যাংশগুলির অর্থ বুঝাইয়া দাও—
(ক) ধান-নাচানো মাঠের হাওয়া (খ) উদাস আদুল গায়ে (ঘ) পাখীর সাঁতার-খেলা (খ) কয়লাগুলো রাঙিয়ে দিয়ে (ঙ) সুড়ঙ্গটি করছে গভীর।

৫। পদান্তর কর :—সরল, মিঠে, উদাস, গভীর, করুণ, ক্ষুব্ধ।

৬। কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :—
(ক) ছুটব আমি **সরল প্রাণে** পর্ণ কুটীর হ'তে
(খ) কান জুড়াবে পাখীর গানে
(গ) টানব যাঁতার দড়ি

৭। মুখে মুখে উত্তর দাও—
(ক) ভারতকথা, রামায়ণ সম্বন্ধে কি জান ?
(খ) সীতা কে ? 'বনবাসের করুণ কথা'—তুমি কি জান ?
(গ) আঁধার, উদাস, কুঁড়ে, নেহাই—এইগুলি কি পদ ?

[রবীন্দ্র শিষ্যদের সর্ব্বপ্রধান যতীন্দ্রমোহন। ছাত্র অবস্থা হইতে তিনি সেকালের 'ভারতী' 'সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করিতেন। বাংলার পল্লীপ্রকৃতি ও বাঙালী জীবনের সুখদুঃখ তাঁহার ভাবকল্পনায় সঞ্জীবিত হইয়াছে তাঁহার কাব্যে। কবির রচিত কাব্যগুলির মধ্যে প্রধান—রেখা, লেখা, অপরাজিতা, নাগ কেশর, মহাভারত]

পাটের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ঘাটের ডিঙা বাই—
বাটের সাথে হাটের সাথে কোন বাঁধন নাই ;
শিরাওঠা ফাটা হাতে হালের গোড়া ধরি,
আমি শুধু আপনমনে এপার-ওপার করি।
ভাদর আসে সারা গাঙে ভরা পাথার নিয়ে—
রাঙা জলে এপার-ওপার একশা করে দিয়ে।
লগির গোড়ায় পায় না তলা মিলে না আর থই
দিনে রাতে তবু আমার ঘাটের ডিঙা বাই।
কোমরজলে দাঁড়িয়ে ক'ষে কাস্তে চালায় চাষী,
ধানের শীষের সোঁদা গন্ধ হাওয়া ওঠে ভাসি'।
কাজল-কটা ধানের ডগা নুইয়ে জলের তলে,
মসমসিয়ে তারি মাঝে ডিঙা আমার চলে!
আঁটি বাঁধা ধানের রাশি এপার ওপার করি,
পালা-বাঁধা পাটের গাদা বোঝাই করে মরি—
দিনে রাতে কত লোকের কত কথাই শুনি—
আমি বসে' আপন মনে খেয়ার কড়ি গুনি।

জলের গায়ে সিঁদুর ঢেলে সূর্য উঠে পূবে,
দিনের খেয়া সেরে আবার পশ্চিমেতে ডুবে,—
বারোমাসের একটি দিনও ছুটি কামাই নাই,
তারি সাথে আমি আমার ঘাটের ডিঙা বাই।

—যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

অনুশীলনী

১। খেয়ামাঝির চোখে নদীতীরের যে ছবি ধরা পড়িয়াছে তাহা বর্ণনা কর।

২। সরলার্থ লিখ :—

(ক) দিনে রাতে……খেয়ার কড়ি গুনি।

(খ) বারোমাসের……ডিঙা বাই।

৩। পদ পরিবর্তন কর :—

দিন, রাঙা, সোঁদা, সিঁদুর, ফাটা, জল।

৪। বাক্য রচনা কর :—

শিরা-ওঠা, কাজল-কটা, পালা-বাঁধা, এপার-ওপার, মসমসিয়ে।

৫। শব্দার্থ লিখ : —

বাট, একশা, পাথার, লগি, ডগা, কড়ি, কামাই।

৬। মুখে মুখে বল—

(ক) "বাটের সাথে হাটের সাথে কোন বাঁধন নাই"—কথাটির মানে কি ?

(খ) খেয়ামাঝির দুঃখের কথা এখানে কি বলা হয়েছে ?

(গ) থই, বাই, একশা, সেরে—এইগুলি কি পদ ?

(ঘ) কবিতার মধ্যে চাষবাসের কি কথা আছে—সংক্ষেপে বল।

[বর্দ্ধমান জেলার 'উজানী' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কুমুদরঞ্জন। তাঁহার কবিতায় বাংলার পল্লী তীর্থের গৌরব লাভ করিয়াছে। বাঙালীর প্রাণের অকৃত্রিম অনুভূতিরসে সঞ্জীবিত তাঁহার কবিতা—সর্বত্র ভক্তি বা প্রীতির আবেগে অশ্রুসজল; তাঁহার কাব্যের নাম—উজানী, একতারা, বনতুলসী, বনমল্লিকা।]

একটি শুধু পয়সা দিয়ে বকেছিলাম কত
আজকে তাহা বিঁধছে বুকে কুশাঙ্কুরের মত।
সাধ্য নাহি তুলতে ত আর,
শক্তি নাই ভুলতে ত আর,
জনম ধরে রয়ে গেল নিজের দেওয়া ক্ষত।
ক্ষমা চাওয়ার সময় গেছে চাব কাহার কাছে,
ভিখারী আজ নাগাল ছাড়া সুদূর দেশে গেছে।
সে কথা ত' কয়নি কিছু
ছিল করে মুখটি নীচু
মেলি দুটী চক্ষু হল অশ্রুভারানত।
হায়রে কথা, ছোট্ট কথা কেনই বা হায় বলা,
রাখলে এমন দারুণ দাগা মর্ম্মভেদী ফলা।
নয়ন জলে ধোয় না তাহা
অনুতাপে নোয় না তাহা
দেওয়া তামার তাম্রশাসন শাসছে অবিরত।

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

॥ অনুশীলনী ॥

১। কবিতাটির ভাববস্তু নিজের ভাষায় লিখ।

২। সরলার্থ লিখ :—

(ক) হায়রে কথা,……মর্ম্মভেদী ফলা।

(খ) নয়ন জলে……শাসছে অবিরত॥

৩। শব্দার্থ লিখ :— কুশাঙ্কুর, ক্ষত, নাগাল, অশ্রুভারানত, দাগা, মর্মভেদী, ফলা, সাধ্য, তাম্রশাসন, অনুতাপ।

৪। উপরে লিখিত শব্দগুলি দিয়া বাক্য রচনা কর।

৫। মুখে মুখে বল—

(ক) 'তামার বিষ' কথাটির মানে কি ?

(খ) কবি কার জন্য দুঃখ করেছেন ?

(গ) চাব, দাগা, ক্ষমা, অবিরত – এইগুলি কোন পদ ?

(ঘ) তুমি নিজে কবিতাটির একটি নাম দাও।

(ঙ) নীচু, সুদূর, ছোট্ট, ক্ষত – এইগুলির বিপরীত পদ বল।

[আধুনিক কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট স্থান আছে। এই ইঞ্জিনিয়ার কবির লেখায় আছে ভাষা ও ভাবের বলিষ্ঠতা ও তীব্র অনুভূতি। মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, এবং সায়ম্—যতীন্দ্রনাথের কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ।]

আষাঢ় গিয়েছে, শ্রাবণ গিয়েছে ভাদর বসেছে যেতে,
কেহ নাহি তার শেষ বারিধারা নিতে হায় মাথা পেতে'
আজি আকাশের চোখে শেষ জল ঝরায় ভাদর রাতি,
গোপনে ধরনী ধরিছে সে ধারা শেষ অঞ্জলি পাতি।
তোমরা শিশুর দলে
কে ভিজিতে চাও এই সন্ধ্যায় শেষ বাদলের জলে?
বর্ষার ছাঁটে যে-সব সুবোধ শার্সি আঁটিয়া আছে,
বাদলের হাওয়া অঙ্গে লাগিলে যারা ঘন ঘন হাঁচে,
তাদের নিও না সাথে,
বর্ষা এড়ায়ে ঘরে থাক তারা বেঁচে থাক দুধেভাতে।
তোমাদের মাঝে অবুঝ যাহারা কারণে ও অকারণে
বর্ষায় ভেজা ভালবাসো ভাই তারা এসো মোর সনে।
এসো দেখে আসি ভাঙিছে পদ্মা শেষ বালুবন্ধন,
এসো শুনে আসি বাতাসের শেষ অরণ্যে ক্রন্দন
ভাদরের ব্যথা বুঝাবার নহে—বড় দুর্দিন ভাই,
আঁধারের শূত বজ্রে ঘোষিছে আশ্বিনে হাসি চাই,
তোমরাও ভাই হেসো।

শুধু বাদলের বিদায় বেলায় বারেক বাহিরে এসো।
এবারের মত বাদল ফুরায় বিদায় দিই গে চল,
আবার বাদল আসে কি না আসে কেবা জানে ভাই বল।

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

অনুশীলনী

১। কবি বাদলকে বিদায় দিবার জন্য কাহাদের এবং কেন ডাক দিয়াছেন ?

২। বাদলের ব্যাথাকে কবি কী ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, নিজের ভাষায় লিখ।

৩। কবিতাটির অন্তর্নিহিত ভাবটি সংক্ষেপে লিখ।

৪। সরলার্থ লিখ :

(ক) আজি আকাশের······অঞ্জলি পাতি।

(খ) ভাদরের ব্যাথা······আশ্বিনে হাসি চাই।

(গ) এবারের মত······কেবা জানে ভাই বল।

৫। শব্দার্থ লিখ :—অঞ্জলি, দুর্দিন, শূত, বালুবন্ধন, বারেক।

৬। কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর :—

(ক) **আজি** আকাশের **চোখে** শেষ জল ঝরায় ভাদর রাতি,

(খ) তোমরা শিশুদের দলে কে ভিজিতে চাও সন্ধ্যার শেষ বাদলের জলে।

(গ) ভাঙিছে পদ্মা যে বালুবন্ধন।

৭। মুখে মুখে উত্তর দাও : —

(ক) এই কবিতায় কোন্ সময়ের কথা বলা হয়েছে ?

(খ) ধরণী, অঞ্জলি, ঝনঝন, অবুঝ—এই শব্দগুলি দিয়ে মুখে মুখে বাক্য তৈরী কর।

[কবি-শিক্ষক-সমালোচক কালিদাস রায়। কবিতায় পাই তাঁহার বাংলা দেশের প্রতি গভীর ভালবাসা, বিশেষত পল্লীপ্রীতি, সহজ জীবনের প্রতি আকুতি। মনে-প্রাণে কবি বৈষ্ণব—ভক্তিরসের পথিক। আজীবন বঙ্গবাণীর সেবক কালিদাস রায় একালের পুরাতন ধারার কবি। তাঁহার কবিতাগ্রন্থগুলির নাম—পর্ণপুট, ব্রজবেণু, ক্ষুদকুঁড়া, বৈকালী।]

পিতা আসিলেন বাড়ী রাঙা চুড়ি, রাঙা শাড়ী
আনিলেন মেয়েটির তরে,
সে চুড়ি পরি' হাতে সে আজ আমোদে মাতে
দেখায়ে বেড়ায় ঘরে ঘরে।
শানাই শুনিয়া কানে পূজার মণ্ডপ পানে
ছুটে যেতে পড়িল ধুলায়,
ভাঙিয়া কাচের চুড়ি একেবারে হ'ল গুঁড়ি
ক্ষতি তার ক্ষতেরে ভুলায়।
উঠিবে না ধুলা ঝাড়ি' ফিরিতে চাহেনা বাড়ী
কাঁদে শুধু গলা ছাড়ি দিয়া,
ভাঙা চুড়ি বারবার জোড়া দেয়, হাহাকার
করে পথে লুটিয়া লুটিয়া!
পিতা আসি তুলে বুকে বলে, চুমা দিয়ে মুখে,
"গেছে যাক ভারি এর দাম"
থামে নাক' কোন মতে তবু খুকী শুয়ে পথে
ফুঁপে ফুঁপে কাঁদে অবিরাম।
ব্যথা কী বুঝিবে তারা সব জিনিসের যারা
দাম কষে টাকায় আনায়?

দরদের ধন হেন যত তুচ্ছ হোক কেন,
মিলিবে কি রূপায় সোনায় ?
সমগ্র বালিকাপ্রাণ চুড়ি সনে খান খান
বল' কেবা দিবে দাম তার ?
এমন পূজার দিনে সেই রাঙা চুড়ি বিনে
তার যে এ ভুবন আঁধার ॥

—কালিদাস রায়

॥ অনুশীলনী ॥

১। বালিকার প্রাণের ব্যথা কবি যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, নিজের ভাষায় তাহা বর্ণনা কর।

২। সরলার্থ লিখ:—

(ক) ক্ষতি তার ক্ষতেরে ভুলায়।

(খ) ব্যথা কি বুঝিবে...... টাকায় আনায় ?

(গ) দরদের ধন ...মিলিবে কি রূপায় সোনায় ?

৩। বাক্য রচনা কর :—আমোদ, হাহাকার, অবিরাম, দরদ, সমগ্র, খান-খান, ভুবন, আঁধার।

৪। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :— (ক) ফিরিতে চাহেনা বাড়ী, (খ) দাম কষে টাকায় আনায় (গ) ভাঙা চুড়ি বারবার জোড়া দেয়, (ঘ) এমন পূজার দিনে।

৫। মুখে মুখে উত্তর দাও —

(ক) রাঙা, যাতে, গুঁড়ি, কষে —এইগুলি কোন পদ ?

(খ) বালিকার কাঁদিবার কারণ কি ?

(গ) কবিতাটির তুমি অন্য নাম দাও।

বঙ্গমাতা

বিদ্রোহী কবি নজরুল বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করেন। প্রতপ্ত আবেগ ও ছন্দনৈপুণ্য তাঁহার কবিতাকে বিশিষ্ট করিয়াছে। তাঁহার কাব্য বিদ্রোহী যুবমানসের প্রতিচ্ছবি। তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির নাম—অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, দোলনচাঁপা, ছায়ানট।]

শ্যামলা বরণ বাঙলা মায়ের রূপ দেখে যা, আয়রে আয়।
ভূধর বনে নদীর তটে প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়॥
ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে দেখে যা মোর কালো মাকে,
ধুলি রাঙা পথের ফাঁকে বৈরাগিণী বীণ্ বাজায়॥
ভীরু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় পল্লীগ্রামে একলাটি,
বিজন মাঠে গ্রাম সে বসায় নিয়ে কাদা খড়মাটি।
কাজল মেঘের ছারি নিয়ে করুণার সে জল ছিটায়।
কাজলা দীঘির পদ্মফুলে যায় দেখা তার পদ্মমুখ,
খেলে বেড়ায় ডাকাত মেয়ে বনে লয়ে বাঘ ভালুক;
ঝড়ের সাথে নৃত্যে মাতে বেদের সাথে সাপ নাচায়॥
নদীর স্রোতে পাথর নুড়ির কাঁকনচুড়ি বাজছে তার,
দাঁড়ায় সাঁঝের অলিন্দে সে টিপটি পরে সাঁঝ তারার;
উষার গাঙে ঘট ভরিতে যায় সে মেয়ে ভোরবেলায়॥
হরিৎ ক্ষেতে লুটায় আঁচল, ঝিল্লীতে তার নূপুর বাজে;
ভাটীর স্রোতে গায় ভাটিয়াল, গায় সে বাউল মাঠের মাঝে,
গঙ্গাতটে শশ্মান ঘাটে কেঁদে কভু বুক ভাসায়॥

—কাজী নজরুল ইসলাম

অনুশীলনী

১। বাংলা দেশের রূপ কবিতাটিতে যে ভাবে ফুটিয়াছে তাহা বর্ণনা কর।

২। সরলার্থ লিখ :—(ক) ধানের ক্ষেতে······সে জল ছিটায়। (খ) কাজলা দীঘির······সাপ নাচায়। (গ) দাঁড়ায়······বুক ভাসায়।

৩। শব্দার্থ লিখ :—শ্যামলা, ভূধর, বীণ, বিজন, অলিন্দ, হরিৎ, ভাটী, ভাটিয়াল।

৪। বাক্য রচনা কর :—ধূলিরাঙা, বৈরাগিনী, সাঝতারা, কাঁকনচুড়ি, বাউল।

৫। পদ পরিবর্তন কর : —ভীরু, করুণা, বরণ, রাঙা।

৬। মুখে মুখে উত্তর দাও—

(ক) কবিতাটি মুখস্থ বল।

(খ) "কালো মাকে" —এটি কাকে বলা হয়েছে ?

(গ) ভাটিয়াল, বাউল—কাদের বলে ?

(ঘ) 'ডাকাত মেয়ে'—কাকে বলা হয়েছে ?

(ঙ) 'বৈরাগিণী কে ? কেন তাকে বৈরাগিণী বলা হয়েছে ?

S.C.E.R.T., West Bengal Library